এক বিকৃত শক্তিনীতি ও পরমাণু বিদ্যুৎ পৃষ্ঠা ২

রমার খোরো চাষ পৃষ্ঠা ৩

বাজারের পাকেচক্রে চাষিসমাজ পৃষ্ঠা ৪

চাষির সঙ্গে কথাবার্তা দ্বিতীয় অংশ
বিষয় : চাষির কাছে বোরো ধান চাষ কতটা উপযোগী পৃষ্ঠা ৬

চাষির অন্য চিন্তাভাবনা
নমুনা সমীক্ষা : পূর্ব মেদিনীপুর জেলার
ইচ্ছাবাড়ি গ্রামের জানা পরিবার পৃষ্ঠা ১৫

কৃষির পট পরিবর্তন
একটি সংলাপ পৃষ্ঠা ২১

চিঠিপত্র
বিষয় : মন্থন পৃষ্ঠা ২৪

মে–জুন ২০১২ ❐ ত্রয়োদশ বর্ষ ❐ তৃতীয় সংখ্যা ❐ ৬ টাকা

মন্থন
সাময়িকী

সারের অসারত্ব

ক্ষুব্ধ চাষিরা বলছে, সারের দাম হুহু করে বাড়ছে, সারে খুব ভেজাল দেওয়া হচ্ছে, ইত্যাদি। 'সার' মানে হল এমন এক পদার্থ যা জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। অভিধানেও এমনই লেখা আছে। অভিধানে এই কথার আরও কিছু অর্থ পাওয়া যায়। যেমন, শ্রেষ্ঠ, তেজ, বীর্য, মর্মার্থ (আমরা বলি সারকথা, সারাংশ)। অন্যদিকে মার্কিন নৃতাত্ত্বিক স্টিফেন মাইকসেল এই সংখ্যায় তাঁর লেখায় ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন, 'সার' মাটির উর্বরতাকে ধ্বংস করে আর সেজন্যই একে 'সার' বলা যায় না। তিনি সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন, এটা ঠিক যে সার গাছের বৃদ্ধি ঘটায়, কিন্তু কীসের বিনিময়ে? তাঁর যুক্তিকে যদি মেনে নিই, তাহলে বলতে হয়, যে জিনিসটা আদতে ভেজাল, তাকে আর আলাদা করে 'ভেজাল' বলে গাল দিই কীভাবে?

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসা চাষি পরিবারের এক যুবক আমাকে ১০:২৬:২৬ সারের কথা বুঝিয়ে বলছিলেন। এটা তিনটি রাসায়নিক পদার্থের এক আনুপাতিক মিশ্রণ। এর গুণ বোঝাতে তিনি আমাকে বললেন, 'এটা হল ধানগাছের রক্ত'। এরকম অনেক 'সারকথা' আমাদের রোজ টিভিতে পাখিপড়া করে বোঝানো হয়। বাচ্চাদের সঠিক বৃদ্ধির জন্য, মেধার জন্য, এনার্জির জন্য কী কী খাওয়ানো দরকার। হরলিক্স, কমপ্ল্যান, গ্লুকন–ডি, আরও কত কী! চাষিদের 'সার' দেওয়া ডাল–ভাত–সবজিতে তেজ, বীর্য কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। কোম্পানির বোতলবন্দি 'সার' কিনে বাচ্চাকে খাওয়ানো দরকার। নাহলে সে 'ফেল'!

আসলে চাষি বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ভুল বলছে না। আশু ফলকে তারা দেখেছে। ১৯৮০–৯০ পর্যায়ে চাষে রাসায়নিক সার, কীটনাশক, ভিটামিন এবং অধিক ফলনশীল বীজের ভেলকি তারা দেখেছে। সার গাছের বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। কিন্তু কীসের বিনিময়ে? আজ বর্ধমানের চাষি টের পাচ্ছে মাটি সহ পরিবেশের কী দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি এই আধুনিক চাষের মাধ্যমে হয়েছে। বহু চাষি চাষ থেকে সরে যেতে চাইছে। মোটা টাকায় চাষের জমি বাস্তু এবং অন্য কাজে হাতবদল হয়ে যাচ্ছে। চাষি পালাতে চাইছে!

একই প্রক্রিয়ার বশবর্তী হয়েছে আমাদের মধ্যবিত্ত মন। আমি শুধু শহুরে মধ্যবিত্তদের কথাই বলছি না। বলছি মধ্যবিত্ত মনের কথা। বিত্ত ছাড়াও টিভি এবং আমাদের স্কুল–কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই মনকে গড়ে তোলা হয়েছে। যে মন চাষিকে 'ছোটো' বলে মনে করে, চাষকেও। 'উন্নয়ন'–এর দৌলতে চাষিও এই মধ্যবিত্ত মন পেয়েছে। প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গড়ে ওঠা তার আদি মনের সঙ্গে এই আধুনিক মনের সংঘাত তীব্র হয়ে উঠেছে।

এই সংকট–মুহূর্তে খোলামেলা কথা বলা দরকার, চাষিদের নিজেদের অভিজ্ঞতার পর্যালোচনা দরকার। শহরে আমরা যারা চাষির ফলন কিনে খাই, তার গুণমান–দরদাম–জোগানের ভুক্তভোগী, তাদেরও গ্রামের দিকে চোখ ফেরাতে হবে। শহুরে উন্নাসিকতায় বুঁদ হয়ে থাকা আর চলে না।

শহর আর গ্রামের মধ্যে আজ সরাসরি খোলামেলা কথাবার্তা দরকার।

এক বিকৃত শক্তিনীতি ও পরমাণু বিদ্যুৎ

২৩ জুন শ্যামলী খাস্তগীরের জন্মদিন উপলক্ষ্যে তাঁর বন্ধুদের পক্ষ থেকে দুটি আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। যে পরমাণু শক্তির বিরুদ্ধে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত শ্যামলী খাস্তগীর লড়াই করে গেছেন, সেই বিষয়ে বলবার জন্য গুজরাত থেকে এসেছিলেন ওঁরই বন্ধু সুরেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা গাডেকর। ২৩ জুন শান্তিনিকেতনের পলাশবাড়িতে এবং ২৬ জুন কলকাতার র‍্যাডিকাল হিউম্যানিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাঘরে তাঁরা দুজন বক্তব্য রাখেন। সুরেন্দ্র গাডেকরের ২৬ জুনের বক্তব্যের প্রথম অংশটি হিন্দি থেকে বাংলায় অনুবাদ করে এখানে প্রকাশ করা হল। অনুবাদক শমীক সরকার।

আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে, বর্তমানে ভারতে পরমাণু বিরোধী আন্দোলনের অবস্থাটা কীরকম? আমি বলব, একইসাথে ভালো এবং খারাপ। ভালো, কারণ পরমাণু শক্তির বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিরোধ এখন অনেক শক্তিশালীভাবে হচ্ছে। কুডানকুলাম হোক, হরিয়ানা হোক বা জাইতাপুর — স্থানীয় মানুষ পরমাণু চুল্লির বিরুদ্ধে বড়ো বড়ো মিছিল করছে। এদিক থেকে যদি দেখা যায়, তাহলে সময়টা ভালো, আগের চেয়ে। কিন্তু এত বড়ো বড়ো প্রতিরোধ হওয়া সত্ত্বেও সরকারের ওপর তার কোনো প্রভাব পড়ছে না। সরকার এসবের দিকে কোনো নজরই দিচ্ছে না। এটাই এখন সরকারের নীতি — ওসবের দিকে তাকিও না। মিডিয়াও নজর দিচ্ছে না। ফলে কুডানকুলামে বিশ হাজার লোক জমা হলেও পশ্চিমবঙ্গে সে ব্যাপারে কোনো জনমত তৈরি হবে না। কারণ তা নিয়ে মিডিয়ায় এক লাইনও লেখা হচ্ছে না। ফলে যাই প্রতিরোধ হোক, তা একটা স্থানীয় বিষয় হয়ে থাকছে। স্থানীয়ভাবে তা খুবই বড়ো বিষয় হচ্ছে, কিন্তু জাতীয় ক্ষেত্রে তার কোনো প্রভাব পড়ছে না।

কুডানকুলামে গত কুড়ি বছর ধরে আলাদা আলাদা পর্যায়ে চুল্লি তৈরি হচ্ছে। ১৯৯৭ সালে ওখানকার পরমাণু বিরোধী কর্মীরা আমাকে একবার ডেকেছিল। পরে ওদের মনে পড়ল, ওই সময় দেওয়ালি চলবে। আমাকে ওরা তখন জিজ্ঞেস করল, আমি যাব কি না। আমি বললাম, যাব। ওইদিন ওরা আমাকে নাগেরকয়েলের একটি হোটেলে রাখল। আমি বললাম, 'কেন আমায় হোটেলে রাখছ? আন্দোলনের কোনো কর্মীর ঘরেই থেকে যাব।' ওরা খোঁজাখুঁজি করল, কিন্তু এমন কাউকে পেল না যে আমাকে রাখতে রাজি। তার কারণ ছিল, ওই সময়েরও দশ বছর আগে ১৯৮৭–৮৮ নাগাদ ওখানে একটি মিছিলে গুলি চলেছিল। তাতে ছয় জন মারা গিয়েছিল। অনেক মানুষকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। সেই ঘটনার আতঙ্ক দশ বছর পরেও এতটাই রয়ে গিয়েছিল যে, আমাকে রাখার জন্য কেউই রাজি হচ্ছিল না।

কিন্তু আজকের কুডানকুলামের অবস্থা দেখুন। হাজার হাজার পুলিশ আসুক, সরকার যাই বলুক, লোকের কিছুতে পরোয়া নেই। হাজার হাজার লোক ওখানে জড়ো হচ্ছে। জনচেতনা বেশ ভালোই তৈরি হয়েছে এবং তার জন্য আমাদের এতটুকু কৃতিত্ব নেই। ফুকুশিমার ঘটনার কারণেই পরে ওখানে এইরকম পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। লোকে যা টিভিতে দেখেছে, তাতে বুঝেছে, এটা (পরমাণু শক্তি) তাদের জন্য খুব ক্ষতিকারক।

কিন্তু আমরা যদি ভালোভাবে খতিয়ে দেখি তাহলেই বুঝতে পারব, আপনি কোনো একটা প্রকল্পকে শুধু দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এই কারণেই বাতিল করতে পারেন না। প্রকল্পের কী কী ভালো দিক আছে, কী কী খারাপ দিক আছে, এই দুই দিকই ভালোভাবে বুঝে তবেই সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার। কিন্তু এই সিদ্ধান্তটাও সাধারণ মানুষের হওয়া দরকার। এখন সিদ্ধান্ত নেয় রাজনৈতিক নেতা–নেত্রী এবং কিছু কিছু অফিসার। কিন্তু যারা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, সেই সিদ্ধান্ত ঠিক হোক কি ভুল হোক, তাতে তাদের কিছু আসবে যাবে না। তাদের সবকিছুতেই লাভ। আমরা যদি ভালো করে দেখি, আজ যে যে দেশে পরমাণু চুল্লি বেশি বানানোর কথা উঠছে, সেগুলি হল, চীন, ভারত এবং দক্ষিণ কোরিয়া। এই তিন দেশই এমন, যেখানে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে আমলারা। এদের কেউই নিজেদের পয়সায় পরমাণু চুল্লি বানাচ্ছে না। আমেরিকাতে তিন হাজার ছ–শো কোটি টাকা লোন গ্যারান্টি থাকা সত্ত্বেও কেউ পরমাণু প্রকল্প বানাতে এগিয়ে আসছে না। অপরদিকে, যেখানে লোককে নিজের পয়সা ইনভেস্ট করতে হবে, সেখানেও কেউ এগিয়ে আসছে না। ফুকুশিমার পরে শুধু পরমাণু চুল্লির খরচ নিয়েই কত কথা উঠেছে! উদাহরণ স্বরূপ : ভারতের শেষ চালু হওয়া কাইগা–৪ পরমাণু চুল্লির খরচ কিলোওয়াট প্রতি ১৫০০ ডলার (প্রায় ৮৫ হাজার টাকা)। এখন যারা নতুন চুল্লি স্থাপনের কথা বলছে, তারা কিলোওয়াট প্রতি দর হাঁকছে ৪০০০/৫০০০/৬০০০, এমনকী ১০,০০০ ডলার। পরমাণু শক্তির মূল খরচ শুরুতেই, গঠনগত খরচ। এই খরচের আধিক্যের জন্যই পরমাণু চুল্লি বসাতে চাইছে না কেউ।

আরেকটা বিষয়েও খুব নজর দেওয়া প্রয়োজন। ভারতে আজকেও এক তৃতীয়াংশ লোক বিদ্যুৎ থেকে বঞ্চিত। ১৯৪৭ সালে আমরা যতটা বিদ্যুৎ বানাতাম, তার থেকে আজ আমরা ১৪০ গুণ বেশি বিদ্যুৎ বানাই। কিন্তু এই এতগুণ বেশি বিদ্যুৎ বানানো সত্ত্বেও দেশের এক তৃতীয়াংশ লোক বিদ্যুৎ পাচ্ছে না। সংখ্যায় এটা ১৯৪৭ সালে ভারতের যে জনসংখ্যা ছিল তার থেকে একটু বেশিই হবে।

পরমাণু বিদ্যুৎ থেকে আমরা কেবল বিদ্যুৎ–ই বানাতে পারি, আর কোনো কাজে লাগে না এটা। আর একটা বিষয় এখানে মনে রাখা দরকার, পৃথিবীর কোনো দেশে মোট শক্তি চাহিদার ২৫ শতাংশের বেশি বিদ্যুতের মাধ্যমে পূরণ হয় না। ভারতে মোট শক্তি–চাহিদার ১২ শতাংশ মাত্র বিদ্যুতের চাহিদা। তাই এদিক থেকেও বলা যায়, পরমাণু শক্তি কি পারবে দেশের শক্তি–চাহিদা পূরণ করতে?

পরমাণু কর্তাব্যক্তিরা অনেক উল্টোপাল্টা কথা বলে। ১৯৬২ সালে হোমি ভাবা বলেছিলেন, ২৫ বছরের মধ্যে ২০–২৫ হাজার মেগাওয়াট পরমাণু বিদ্যুৎ দেশে তৈরি হবে। ২৫ বছর পরে ১৯৮৭ সালে বাস্তবে কতটা উৎপন্ন হয়েছিল? ১০০০ মেগাওয়াটের মতো। পরে একই ধরনের আজগুবি কথা বলেছেন বিক্রম সারাভাই বা রাজা রামান্না। রাজা রামান্না ১৯৮৪ সালে বলেছিলেন, ২০০০ সালের মধ্যে আমরা ২০০০০ মেগাওয়াট পরমাণু বিদ্যুৎ তৈরি করব। কিন্তু বাস্তবে হয়েছে ২০০০ মেগাওয়াটের মতো। তাই এই পরমাণু কর্তারা যা করব বলে, তার তুলনায় এরা খুবই কম বাস্তবায়িত করতে পারে। এখন ওরা বলছে, ২০৫২ সালের মধ্যে ২,৫০,০০০ মেগাওয়াট পরমাণু বিদ্যুৎ তৈরি করবে।

... *পরবর্তী অংশ ১৪ পৃষ্ঠায়*

রমার খোরো চাষ

তমাল ভৌমিক

ভাত খাচ্ছি। রোজই খাই। কিন্তু এমন ভাত জন্মে খাইনি। এই ভাতের চাল যে ধান থেকে তৈরি হয়েছে, সেই ধান যে চাষ করেছে, সেই কিষানি আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করছে, কেমন খাচ্ছি। তার নাম রমা। আমাদের ঘরে রোজ ঠিকে কাজ করতে আসে। আমার বউয়ের সঙ্গে তার কথাবার্তায় যা জানা গেছে, তাই এখানে লিখব।

রমা জানা। বছর ৩৫ বয়স। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিদ্যাধরপুর থেকে এসে সাত বাড়ির ঠিকে কাজ করে। ১৯ দিন ছুটি নিয়ে সে গেছিল খোরোর ধান তুলতে। তার নিজের জমি নয়। তার দিদির বাড়ির পাশে পরিচিত একজন তাকে এক বিঘা দু–কাঠা জমি ধান চষতে দিয়েছিল বিনি–পয়সায়।

এই জমির মালিক যারা, তাদের ১৫ বিঘে জমি আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। তার মধ্যে বিঘে পাঁচেক নতুন কাটা খালের পাশে। সেখানে এবার খোরোর চাষ হয়েছে। রমা ছাড়া আরও দুজন ওদের জমি ভাড়া নিয়ে চাষ করেছে। জমির ভাড়া বিঘে প্রতি ১২০০ থেকে ১৫০০ টাকা। যারা জমি ভাড়া নিয়েছিল, তারা সবাই রমার মতো নানারকম কাজ করে সারা বছর সংসার চালায়। কেউ দিনমজুরের কাজ করে, কেউ ছোটোখাটো ব্যবসা করে। আর জমি যারা ভাড়া দিয়েছে, তাদের পরিবারের সবাই অফিসে চাকরি করে। তাদের নিজেদের বাড়ি আছে, গাড়ি আছে — অর্থাৎ মোটরবাইক আছে। তারা নিজেরা চাষ করে না। খোরোর চাষ তো করেই না। খোরোর চাষে ঝামেলা বেশি — জলের খরচ আছে, লোকও লাগাতে হয় বেশি। তবে বর্ষার চাষ ওই পরিবারের পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে দু–একজন করে। করে মানে লোক লাগিয়ে করে। ১৫ বিঘে জমি থেকে বছরের খোরাকির ধানটা ওদের হয়ে যায়।

রমাদের আগ্রহ বেশি খোরো চাষে; কারণ এই চাষে খাটুনি ও খরচ বেশি হলেও ধানের ফলন হয় অনেক বেশি। তবে এই চাষের কায়দা–কানুন জানতে হবে। রমার বর তপন সব জানে, কখন বিষ দিতে হবে, কখন কী করতে হবে। রমার দিদি লীলার বর সেসব জানে না। তাই লীলার ইচ্ছা থাকলেও চাষে হাত দিতে পারে না। এবার তার ইচ্ছা ছিল দশ কাঠা জমিতে ধান লাগানোর। কিন্তু সেও তো কলকাতা গিয়ে সারাদিন ঠিকে কাজ করে, একা পেরে উঠবে না বলে চাষ করেনি — এইসব কথায় দিদির জন্য দুঃখপ্রকাশ করে রমা বলে, "আমরা ছোটোবেলা থেকে চাষ দেখছি, আমরা সব জানি, আমার খুব মন চায় ধান চাষ করি, গতবার পারব কিনা কে জানে?" রমা আগামীবারকে 'গতবার' বলে।

চাষির ঘরের মেয়ে রমা। ধান চাষে তার উৎসাহ দেখবার মতো। গতবারের আগেরবার খোরোর চাষ করেছিল ১৬ কাঠা জমিতে। সেবার ও চাষের জলের অভাবে মার খেয়েছিল। তখন ওখানে খাল কাটা হয়নি বলে জল পায়নি ঠিক মতো; তাছাড়া ধানের বীজটাও ভালো ছিল না। সাকুল্যে চার বস্তা ধান পেয়েছিল। সেবার চাষ মার খাওয়ায় পরের বছর অর্থাৎ গতবছর ধান লাগাতে ভরসা পায়নি। তবু এবার ধান লাগিয়েছে। বাবুবাড়ির কাজ কামাই করে চাষের কাজ করে রমা। বলে, ছাড়িয়ে দিলে ছাড়িয়ে দেবে।

কোন ১৪–১৫ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল রমার। দুই মেয়ের পরে একটা ছেলে। ছেলেকে কুকুরে কামড়ে দিয়েছিল। রমা তখন মাঠ–জমিতে ব্যস্ত। যাকে রেখে গিয়েছিল ছোটো ছেলেকে দেখার জন্য, সে তখন ওখানে ছিল না। ছেলেটা জলাতঙ্কে মারা যায়। তারপর রমার আরেকটা মেয়ে হয়েছে। কিন্তু মরা ছেলের শোক আজও সে ভুলতে পারেনি। সুন্দরবন থেকে বরের সঙ্গে কলকাতার কাছে চলে এসেছে কাজের ধান্দায়। বাসা ভাড়া করেছে বিদ্যাধরপুরে। কিন্তু এখনও দুটো ধান চাষের চেষ্টা করে বছর বছর। ধান হলে যেন সে মরা ছেলেকে ফিরে পাবে।

রমা মিনিকিটের বীজতলা বানিয়েছিল ৬০০ টাকা খরচ করে, খোরো চাষ বসাবে বলে। পরে আরও ২০০ টাকার বীজতলা কিনতে হয়েছে চম্পাহাটি থেকে। রমার বর রঙ–মিস্ত্রি তপন বেশিদিন কাজে যায় না। ছিপ বা জাল নিয়ে খাল– বিলে ঘুরে বেড়ায় মাছ ধরবে বলে। সন্ধ্যেবেলায় মদ খাওয়ার সময় মাছের ঝালঝাল তরকারি রোজ রাতে রেঁধে দিতে হবে। রমা কোনো আপত্তি করলে মারধোর করবে, না হলে ভয় দেখাবে, 'পোকামারা বিষ খাব' বলে। অথবা রাত–বিরেতে মাঠে গিয়ে বসে থাকবে, রমা ঘুমাতে পারবে না, যদি সাপে কাটে বা কিছু হয়, সাধাসাধি করে বরকে ডেকে আনবে। পরের দিন দেরি করে কাজের বাড়িতে গিয়ে বলবে, "এমনি ভালো ঝানো, খুব সুন্দর দেখতে, কাজ করবে যেদিন, অনেকটা টাকা পায়। তার বেশিটাই মদ খেয়ে ফেলবে, আর অ্যাত্তো অ্যাত্তো মাছ কিনবে। অত মাছ ভাজতে তেলও তো কত লাগে বলো? কিচ্ছু বুঝবে না।"

সেই তপন এবার রাজি হয়েছিল রমার চাষের কাজে গতর দেবে বলে। প্রথমবার চাষের পর সে–ই সার দিয়েছে। পরে আবার চাষ। মোট তিনবার জমিতে মেশিনে চাষ দিতে (প্রতিদিন ঘণ্টা তিনেক ২০০ টাকা করে চাষ দিতে) মোট ১১৫০ টাকা রমার খরচ হয়েছে। এখনও তার ৫০০ টাকা বাকি। সারের জন্য একবার ৫০০ টাকা, আরেকবার ৬০০ টাকা, মোট ১১০০ টাকা খরচ হয়েছে। সারের নাম অবশ্য রমা জানে না। ধানের পোকামারার ওষুধের নামও বলতে পারে না। বলে, "১৬০ টাকা করে বোতল, দুই কি তিন বোতল লেগেছে, সেসব আমার বরই জানে, ও–ই সব করেছে। মোট ৪৫০ টাকা দিয়েছি। তার থেকে ও কিছু ঝেড়েও দিতে পারে মদ কেনার জন্য। একবার জিজ্ঞেস করেছি তো বলল, 'তোর সন্দেহ হলে তুইই নিয়ে আয়।' আমি কী করে বিষ কিনতে হয় জানি?"

খোরোর চাষে জলও লেগেছে অনেক, সপ্তাহে দু–বার করে ৫ ঘণ্টা ধরে জল দেওয়া হয়েছে। ৬০ টাকা ঘণ্টা হিসেবে পাম্পের জলের জন্য খরচ হয়েছে মোট ২৫০০ টাকা। তাছাড়া ধান কাটার জন্য এক বোন আর বোনঝিকে ১০০ টাকা করে আর এক ভাগ্নেকে ৫০ টাকা দিয়ে বাকি কাজটা রমা আর তপনই করেছে। নিড়ানোর কাজও ওরা স্বামী–স্ত্রীতেই করায় আর লোকের পিছনে খরচ হয়নি। তবে ধান ঝাড়ার জন্য ১০০ টাকা মেশিন ভাড়া দিতে হয়েছে; সকাল ছ–টা থেকে দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত তিনজন লোক ১০০০ টাকায় ধান ঝেড়ে দিয়েছে। ধান আঁটি বেঁধে মাঠ থেকে ঘরে এনেছে রমা আর ওর বর।

এবারে ধান রাখার ঝামেলা। গোলা নেই। ষোলো বস্তা ধান হয়েছে, প্রতি বস্তায় ৬০ কিলো ধান। অত ধান রাখবে কোথায়? ৩০ টাকা করে দুটো বস্তা কিনে ঘরে রেখেছে। ১৪০ টাকা দিয়ে একটা কালো প্লাস্টিক কিনে দিদির বাড়িতে একটু জায়গা আছে, সেখানে রেখেছে। বস্তা প্রতি ২৪ টাকায় চার বস্তা ধান ভেনে প্রতি বস্তায় ৩৫ কিলো করে চাল পেয়েছে। সে চাল তিন কিলো করে দিদি, বোন, মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে সবাইকে দিয়েছে। এখন ঘরে চাল রাখার জায়গা নেই। ধান-চাল এত যে শুধু ইঁদুরেই খায় না, মানুষেও চুরি করে — রমার খুব চিন্তা।

লোকটা তো মদ খেয়ে থাকবে — এদিকে রমাকে কাজে আসতে হবে। কে ধান-চাল পাহারা দেবে? মেয়েগুলোর সব বিয়ে হয়ে গেছে। আর কেউ যেন রমাকে একটু সাহায্য করতে চায় না। বড়ো বড়ো ধান সিদ্ধ করার হাঁড়ি একা টেনে তুলতে গা-কোমর সব ব্যথা। সেই হাঁড়ি-হাঁড়ি ধান সিদ্ধ করে ছেঁকে রোদে শোকানো। একা হাঁফিয়ে ওঠে রমা। মেয়েদের ডাকলে, শুকাতে দেওয়া ধান দু-একবার মেয়েরা পা দিয়ে উল্টে দিয়েই বলে, "মা খড়গুলো দে, শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যাই।" চার কাহন খড় হয়েছিল। ১৫০ টাকা ঠেকিয়ে দিয়ে বাড়িওয়ালা বুড়ো মাঠ থেকে দেড় কাহন খড় নিয়ে গেল। গত বর্ষায় চাষ জলে ডুবে যাওয়ায় খড়ের দাম এখন অনেক বেশি — ৪৫০ টাকা কাহন। সে কথা রমা বলতেই বুড়ো ঝেঁজে উঠল, "তোর বর যে টাকা ধার নিয়েছিল সেটা শুধবে কে?" বর তো চুপচাপ। রমা ভাবে, "যাব্বাবা, আমারই সব যাবে?" মুখে কিছু বলে না। ধান সিদ্ধ করতে আরও দেড় কাহন খড় জ্বালানিতে গেছে। এখন মেয়ে বলছে বাকি এক কাহন নিয়ে যাবে। সাড়ে চারশো টাকা দাম। ওদিকে পাম্পের জলের দাম ৫০০ টাকা এখনও বাকি। রমার বর বলে, "মেয়েকে দিয়ে দে"। রমা শুধু ধানের দিকে তাকিয়ে সব সয়ে যায়।

পারে। রমাই পারে। রমার মতো আরও কেউ আছে, আমরা চিনি না। রমাকে চিনি। মানে ধীরে ধীরে চিনেছি। কখনো সে এসে বলেছে, "কাল খুব ঝামেলা হয়েছে। মেয়ে ফেল করেছে। মেয়ের বাবা এসে কী মার মারল। আমার খুব রাগ হয়েছে। গায়ে হাত দেবে কেন? ফেল করেছে তো কী হয়েছে? সবাই কি পাশ করে? তুমি বলো তো বউদি, কেউ কি ফেল করবে না? তাহলেই মারতে হবে?" কখনো রমা এসে ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে বাসন মেজেছে আর হাসতে হাসতে বলেছে, "জানো, কাল অষ্টপ্রহর কীর্তন শুনেছি সারা রাত জেগে। টিকিট কেটে গিয়েছিলাম। দিদিরা বলছিল, 'এসব কী শুনতে যাস পয়সা খরচ করে?' আমার কিন্তু খুব ভালো লাগে। গানের মাঝে মাঝে ভালো ভালো কথা বলে। শুনতে শুনতে মনটা কেমন হয়ে যায়। সবটা অবশ্য শুনতে পারিনি। শেষের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।" কখনো অন্য কাজের বাড়িতে অন্যায় কথা শুনে এসে রাগের চোটে এমন জোরে খিস্তি দিয়ে ফেলে যে বউদি চমকে উঠে 'আস্তে রমা আস্তে' বলে হেসে ফেলে।

বাবুদের কানে লাগার মতো খিস্তি চাষাভুষোরা তো দিতেই পারে। কিন্তু, এই যে সারাদিন খেটে পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে রাত জেগে কীর্তন শুনতে যাওয়ার মন, তার ভিতরে কোথাও যেন এঁটেল মাটি আছে। পাশ ও ফেলের মধ্যে কোনো হিংস্র লাল দাগ না রাখার মানসিকতায় কোথায় যেন একটা 'আমরা চাষ করি আনন্দে' গানের মতো ফলাফল নিরপেক্ষ কাজের মতো একটা সুর আছে রমার অন্তরে। এরকম এক চাষির হৃদয় চিনে উঠতে অনেকটা সময় লাগে আমার। হয়তো চাষ ব্যাপারটা খুব কম জানি বলে।

এবার ১৯ দিন পরে কাজে ফিরে এসে রমা বলল, "ধানের কোনো দাম নেই বউদি জানো, বস্তায় ৪৫০-৫০০ টাকা দিতে চাইছে। আমার ষোলো বস্তা ধানে খরচই হয়েছে সাড়ে সাত-আট হাজার টাকা। আমি বলেছি একটা ধানও বেচব না। আগের ফাল্গুন মাস অবধি আমার চলে যাবে। এত সরু চাল কোনোদিন খাইনি। নিজের চাষ করা ধানের চাল খাচ্ছি। কী যে আমার মনে হচ্ছে কী বলব। কী যে সুন্দর চাল। তোমাদের জন্য এক কিলো নিয়ে আসব। বেশি তো বইতে পারব না, খেয়ে দেখো।"

দেখলাম শ্যামবর্ণা রমা উনিশ দিন বৈশাখের খর রোদের সমুদ্রে স্নান করে আরও ঘন শ্যামবর্ণ হয়ে ফিরে এসে আমাদের ঘরে দাঁড়িয়েছে — যেন শহরের টিউবলাইটের আলোয় সিমেন্টের মেঝের ওপর একগুচ্ছ সবুজ সতেজ ধান।

বাজারের পাকেচক্রে চাষিসমাজ

মুহাম্মাদ হেলালউদ্দিন

আমি মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রামের ছেলে। কর্মসূত্রে কলকাতায় বসবাস করি। শহরে আমাদের চাল কিনে খেতে হয়। এই আষাঢ় মাসের শেষে কলকাতায় মিনিকিট চাল বিক্রি হচ্ছে ২৫-৩০ টাকা কেজি দরে। গ্রামে গিয়ে যখন আড়তদারের সঙ্গে কথা বললাম, আমি জানতে পারলাম, আড়তে এখন মিনিকিট (শতাব্দী, লোকাল) ধানের দর ১০৮০ টাকা/কুইন্টাল, চালের দাম ২৩০০ টাকা/কুইন্টাল। তাহলে কেজিতে তার দাম পড়ছে ২৩ টাকা। কলকাতার সঙ্গে দামের খুব হেরফের নেই। কিন্তু চাষিদের কাছে গিয়ে শুনছি, বোরো ধান ওঠার পর তারা ধানের উপযুক্ত দাম পায়নি। গত বছরের চেয়েও কম দামে নিজেদের চাষের ধান বিক্রি করতে হয়েছে। অথচ চাষের খরচ আগের চেয়ে বেড়ে গেছে।

আগেকার দিনে আমাদের গ্রামে ঘরের মেয়েরা নিজেরাই চাল তৈরি করে নিত। যারা বড়োলোক, তারা চারপাশে থাকা গরিব মেয়েদের দিয়ে চাল তৈরি করিয়ে নিত। ঘরে এখন কাজের লোক নেই। ছেলেরা বাইরে কাজে চলে যাচ্ছে। আট-দশ বছর আগেও গ্রামে চাল বিক্রি হত না। এখন তো চাষিঘরেও চাল কিনে খাওয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, চাষি সুদে মোটা টাকা ঋণ নিয়ে বোরো চাষ করে তাড়াহুড়ো করে ধানটা বেচে দিচ্ছে। আবার সেই চাষিই বাজার থেকে চড়া দামে চাল কিনে খাচ্ছে! মিল মালিকের ধান কিনেও লাভ, চাল বেচেও লাভ! বাজারের এই পাকচক্রটা বুঝতে আমি পরিচিত কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁদের বয়ান এখানে দেওয়া হল।

হাবিব মোস্তফা, বাগনান, হাওড়া

আমাদের এলাকায় মূলত এন শংকর ও রোলাট ধানের বোরো চাষ

হয়। এখানে ৩৩ শতকে এক বিঘা। ধান তোলার সময় ১৫ বৈশাখ নাগাদ ধানের দাম ছিল এক বস্তা (৬০ কেজি) ৫৫০ টাকা। এক বিঘা জমিতে আমার ধান হয়েছিল ২০ মণ (১ মণ = ৪০ কেজি)। ২০ মণ ধানের দাম পাওয়া গেছে ৭৫০০ টাকার মতো। আমরা যারা পরের জমি নিয়ে চাষ করি, জমির মালিককে বিঘা প্রতি ১৫০০ টাকা দিতে হয়েছে। সরকারি ডিপ টিউবওয়েলের জন্য বিঘা প্রতি ৭০০ টাকা দিতে হয়েছে। বীজধান, সার, কীটনাশক, জনমজুর, ট্রাক্টর সব মিলিয়ে প্রায় ৫০০০ টাকা খরচ হয়েছিল। তাহলে আমার এক বিঘা চাষে খরচ হয়েছে মোট ৭২০০ টাকা। এর মধ্যে আমার ব্যক্তিগত শ্রমের দাম ধরা হয়নি। তাহলে ৭২০০ টাকা খরচ করে আমি পেয়েছি ৭৫০০ টাকা।

ধানের এই দর অনুযায়ী এক কেজি ধানের দাম পড়ছে ৯ টাকা। এলাকার আড়তদার ধান কিনে নিয়ে গিয়ে মিলে দেয়। মিল থেকে চাল আসে। এই আষাঢ় মাসে বাজারে এক কেজি চালের দাম ২০–২২ টাকা। আমি বাজার থেকে চাল কিনি না। ধান কিনে ঘরে চাল তৈরি করি। ফলে বাজারের বাড়তি দামের বোঝা আমার ওপর পড়ে না। তিন কেজি ধানে দু-কেজি চাল হয়। তিন কেজি ধানের দাম ২৭ টাকা। দু-কেজি চালের দাম ৪০–৪৪ টাকা। এক বস্তা ধান ভানতে ১৫ টাকা খরচ পড়ে। ধানের গুঁড়োতে জ্বালানি হয়। নিজেদের শ্রমের দাম ধরা হয়নি।

আমার নিজের জমিতে চাষ করলে মালিককে দেওয়া ১৫০০ টাকা বেঁচে যেত। নিজের ঘরের থেকে পুরো শ্রম দিতে পারলে আরও খরচ বাঁচত। তবে সেটাও লাভজনক নয়।

গ্রামে বারোমাস কাজ পাওয়া যায় না। শহরে পাওয়া যায়, মজুরিও বেশি। ধান রোয়া ও কাটার সময় কটা দিন হয়তো ২০০–২৫০ টাকা মেলে। কিন্তু দিল্লি-মুম্বাইয়ে সবসময় বিল্ডিং তৈরির মিস্ত্রির কাজ পাওয়া যায়। জোগাড়ের কাজ করলেও ৩০০ টাকা রোজ পাওয়া যায়। ওভারটাইম পাওয়া যায়, তাতে মজুরি বেশি। বেশি মজুরি আর শহরের জাঁকজমকের জীবন টানে বইকি।

সন্ধি সাহা, খড়গ্রাম, মুর্শিদাবাদ

দেড় বিঘা জমিতে বোরো চাষ করেছিলাম। এখানে ৪০ শতকে বিঘা। ২০ বৈশাখ ধান উঠেছে। ধান পেয়েছিলাম ১১ কুইন্টাল বা ১১০০ কেজি। সেই সময়ই ৬৮০ টাকা/কুইন্টাল দরে ধান বিক্রি করেছি। ধানের দাম পেয়েছি ৭৪৮০ টাকা, খড়ের দাম পেয়েছি ৩০০ টাকা, মোট আয় ৭৭৮০ টাকা। আমার সব হিসাব ধরে এবারে লোকসান হয়েছে।

ধান রোয়ার সময় ১০:২৬:২৬ সার দিয়েছি ১২০ কেজি, দাম ১৯২০ টাকা; চাপান ইউরিয়া দিয়েছি ৬০ কেজি, দাম ৪২০ টাকা; ডিপ টিউবওয়েলের জল বাবদ লেগেছে ১৫০০ টাকা; রোপন করার লেবার লেগেছে ৬টা, ১২০০ টাকা; ট্রাক্টর ৪২০ টাকা ও লাঙল ৩০০ টাকা; ধান কাটায় ৬টা, আঁটি বাঁধায় ৪টে, ধান পিটানোতে ৪টে, মোট ১৪টা লেবারে ২০০ টাকা করে ২৮০০ টাকা; ধান আনতে গাড়ি ভাড়া ৪০০ টাকা লেগেছে। বীজধান এবং নিজের শ্রমের দাম ধরিনি। সব মিলিয়ে আমার খরচ হয়েছে ৮৯৬০ টাকা। অথচ ধান বিক্রি করে পেয়েছি ৭৭৮০ টাকা। এবছর আমার লোকসান হয়েছে হাজার টাকার ওপরে।

১৬০ কেজি ধানে ১০০ কেজি বা এক কুইন্টাল চাল হয়। ২২ আষাঢ় এক কুইন্টাল ধানের দাম ৮৮০ টাকা। একমাসের মধ্যে কুইন্টাল পিছু ২০০ টাকা ধানের দাম বেড়ে গেছে। ১৬০ কেজির দাম ১৪০৮ টাকা, ভানাই খরচ ৯০ টাকা। জ্বালানি হয়ে যায় গুঁড়োতে। অর্থাৎ ১ কুইন্টাল চাল করতে লেগেছে ১৪৯৮ টাকা। তবে বৈশাখ মাসে যখন ধানের দাম কম ছিল, তখন চালের দাম ছিল ১৩০০ টাকা/কুইন্টাল। সেই সময় দরটা নামিয়ে রেখে মিল মালিকেরা চাষিদের ঠকিয়েছে।

নাসির আহম্মদ, আড়তদার, খড়গ্রাম

২২ আষাঢ় ১৪১৯ (ইংরেজি ৭ জুলাই ২০১২) গডরা (বোরো) ধানের দর ছিল ৮৮০ টাকা/কুইন্টাল আর চালের দর ছিল ১৪০০ টাকা/কুইন্টাল। একমাস আগে গডরা ধানের দর ছিল ৭০০ টাকা/কুইন্টাল, চালের দর ছিল ১২০০ টাকা/কুইন্টাল। তখন লোকে প্রশ্ন করেছে, ধানের দাম নেই, চালের দাম বেশি কেন? আমরা ধান কিনে মিলে দিই। মিল থেকে চাল কিনে এনে কিছু লাভ রেখে বিক্রি করি। প্রথমে দর নামিয়ে রেখে চাষির ধানটা টেনে নিয়ে বাড়তি মুনাফাটা মিল মালিকেরা পায়। লোকের কাছে আমাদের জবাবদিহি করতে হয়।

খবর দিন খবর নিন

খবরের কাগজ সংবাদমন্থন

সারা বছরের জন্য চল্লিশ টাকা ডাকযোগে পাঠিয়ে পাক্ষিক এই সংবাদপত্র সংগ্রহ করুন।

যোগাযোগ

জিতেন নন্দী, বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮

দূরভাষ : ২৪৯১৩৬৬৬, ই-মেল : manthansamayiki@gmail.com

চাষির সঙ্গে কথাবার্তা দ্বিতীয় অংশ

বিষয় : চাষির কাছে বোরো ধান চাষ কতটা উপযোগী

'চাষির কাছে ধানচাষ কতটা উপযোগী' এই বিষয়ে কিছু প্রশ্ন নিয়ে আমরা গিয়েছিলাম কোচবিহার, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, বীরভূম, হুগলি, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলার মোট ৩৮টি গ্রামে। মোট ৬২ জন চাষির সঙ্গে আমরা কথা বলেছি। এঁদের মধ্যে রয়েছেন এমন চাষি যিনি ৩০ বিঘা জমিতে ধান চাষ করেছেন, একই সঙ্গে রয়েছেন এমন চাষি যিনি ১ বিঘা বা আরও কম, মাত্র কয়েক কাঠা জমিতে ধান চাষ করেছেন। এঁরা যেমন নিজের জমিতে চাষ করেছেন, আবার অনেকে ভাগে, লিজ নিয়ে বা বন্ধকি জমিতে চাষ করেছেন। এঁদের অনেকে কেবলমাত্র আমন বা বর্ষার চাষ করেছেন; কেউ কেউ আমন এবং বোরো বা খোরো চাষ দুটোই করেছেন। এমনকী এর ওপর কেউ আউশ ধানও চাষ করেছেন। আমন, বোরো এবং আউশের চাষে সাধারণত আমরা অধিক ফলনশীল বীজ ব্যবহার করতে দেখেছি; কিছু ব্যতিক্রমী বা দেশীয় বীজের চাষও রয়েছে।

পত্রিকার জানুয়ারি–ফেব্রুয়ারি ২০১২ সংখ্যায় সর্বশেষ আমন (১৪১৮ বঙ্গাব্দের) চাষের ফলাফল নিয়ে সমীক্ষার প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছিল। তখন বোরো চাষ সবে শুরু হয়েছিল, তাই তার সম্পূর্ণ ফলাফল পাওয়ার পর এই সংখ্যায় সম্পূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে।

পত্রিকার পক্ষ থেকে ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে চাষিদের সঙ্গে এই কথাবার্তা চালানো হয়েছে আলাদা আলাদাভাবে। এক–একটি গ্রামে ব্যক্তি–চাষির সঙ্গে এক–দুইজন গিয়ে প্রশ্নগুলি সামনে রেখে কথা বলেছেন। নির্ধারিত প্রশ্নপত্রের বাইরেও বেশ কিছু কথা হয়েছে। এতে অংশ নিয়েছেন রামজীবন ভৌমিক, প্রসূন রায়, অমিতাভ চক্রবর্তী, মুহাম্মাদ হেলালউদ্দিন, সুশান্ত বোস, ভবেশ মাহাতো, শমিত আচার্য, তরুণ দেবনাথ, বসিরুদ্দিন, শেখ কুরবান আলি, শুভপ্রতিম রায়চৌধুরি, শমীক সরকার, জিতেন নন্দী, অলোক দত্ত, পার্থ কয়াল, মিত্রা চ্যাটার্জি, সুমন রাজ এবং বঙ্কিম।

ধানচাষ : কিছু সাধারণ তথ্য

গ্রামবাংলায় ঋতু বৈচিত্র্য অনুযায়ী চাষের দুটো ভাগ রয়েছে : খরিফ ও রবি শস্যের চাষ। খরিফ বলতে হেমন্তকালীন শস্য এবং রবি হল বসন্তকালীন শস্য। ধান চাষের ক্ষেত্রে আমন খরিফ এবং বোরো রবি শস্য। অতীতে বর্ষার শুরুতে একটা ধান রোয়া হত, সেটা ছিল আউশ; বর্ষার মাঝামাঝি থেকে শেষ পর্যন্ত রোয়া হত আমন ধান। সেই নতুন ধানে নবান্ন হত। বাড়ির ধান ছাড়া নবান্ন হত না। আশ্বিন–কার্তিক মাসে পুজোর মুখে ধানটা উঠে যেত। গ্রামে এবং শহরেও খাদ্যাভাব (ভাতের অভাব) লেগেই ছিল। স্বাধীনতার পর এদেশের খাদ্যাভাব দূর করতে সরকারি উদ্যোগে বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করা হত। যেমন, গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে পিএল ৪৮০ সাহায্য প্রকল্পের মাধ্যমে খাদ্যশস্য আসত। এরপর ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে এল কৃষিতে সবুজ বিপ্লবের ভাবনা। প্রধানত গম উৎপাদক রাজ্যগুলিতে প্রয়োগ হওয়ার পর সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে তা পশ্চিমবঙ্গে এল। খাদ্যাভাব দূর করতে চাষিদের আধুনিক চাষে উদ্বুদ্ধ করা হল। চাষের খেতে শ্যালো টিউবওয়েল লাগিয়ে জলসেচ করে বোরো ধান রোয়া শুরু হল শুষ্ক শীতের মরসুমে। এছাড়া শুরু হল জলসেচ করে আলু, সর্ষের মতো অন্যান্য রবিশস্যের চাষ। বাইরে থেকে অধিক ফলনশীল ধানের কিছুটা খর্বাকৃতি বীজ এল এই বোরো চাষের জন্য। ক্রমশ আউশের চাষ থেকে সরে এসে চাষিরা অধিক ফলনশীল বোরো চাষ করতে লাগল। পশ্চিমবঙ্গ ঘোষিতভাবে খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হল। ১৯৮০–র দশকে গ্রামবাংলায় রেকর্ড পরিমাণ বোরো চাষ এবং ফলন হল। অধিক ফলনশীল বীজ আমন এবং আউশেও ব্যবহার করা হতে লাগল। ১৯৮০ থেকে ২০০৫–০৬ সাল পর্যন্ত সরকারি হিসেবে রাজ্যের ধানের ফলন ৩.৫% হারে বেড়েছে।

২০০৫–০৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের ধানের মোট ফলন ছিল ১৪৫ লক্ষ টন, দেশের মধ্যে সর্বাধিক (জাতীয় উৎপাদনের ১৭%)। এর পরেই ছিল অন্ধ্রপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশের স্থান। যদিও হেক্টর প্রতি ফলনের পরিমাণে পশ্চিমবঙ্গ এই সময় অন্ধ্রপ্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, কর্নাটক ও তামিলনাড়ুর চেয়ে পিছনে ছিল।

পশ্চিমবঙ্গের এই ধান চাষ এখনও মূলত বর্ষার জলের ওপর নির্ভরশীল, মাত্র ৪২% ধানের এলাকা জলসেচের আওতায় এসেছে। ১৯৯০–এর দশকে বোরো চাষের এলাকা বৃদ্ধির হার কমে এল। কারণ বোরো চাষের জমি আর তেমন বাড়ানো যাচ্ছিল না, তাছাড়া জলের সংকট দেখা দিল। সরকারি হিসেবে ১৯৯০–এর দশকে ধানের ফলন বৃদ্ধির হারও নেমে এসেছে ১.৭%–এ। এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের মোট ধানের উৎপাদনের ৬২% আমন, এটাই প্রধান ফসল হিসেবে রয়ে গেছে; বোরো ধানের উৎপাদন প্রায় ৩২% এবং আউশ মাত্র ৩%।

এই রাজ্যে চাষবাসের প্রকৃত অবস্থাটা বোঝার জন্য আরও কয়েকটি কথা গোড়াতেই বলে নেওয়া দরকার। পশ্চিমবঙ্গ হল দেশের মধ্যে সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ রাজ্য। প্রতি বর্গকিলোমিটার এলাকায় ৯০০ জন বাস করে (ভারতীয় গড় বসতির তুলনায় তিনগুণ)। জনসংখ্যার ৭২% গ্রামে বাস করে। সরকারি হিসেব (২০০০–০১ সালের) অনুযায়ী এ রাজ্যের গ্রামীণ জনসংখ্যার ২৫% চাষি অর্থাৎ জমির মালিক, ৩৩% খেতমজুর এবং বাকি ৪২% অন্যান্য কাজে নিয়োজিত। অপর একটি পরিসংখ্যান (এনএসএস বা জাতীয় নমুনা সমীক্ষা) থেকে জানা যাচ্ছে, ১৯৯৯–২০০০ সালে এই রাজ্যের গ্রামীণ জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক ভূমিহীন। অধিক জনঘনত্বের কারণে এখানকার পরিবারপিছু গড় চাষের জমির আয়তন ০.৮ হেক্টর (প্রায় ৬ বিঘা)। সারা দেশের গড় চাষের জমির আয়তন ১.৩ হেক্টর (প্রায় ৯.৬ বিঘা)। এই জমির পরিমাণের বিচারে প্রান্তিক চাষি, যাদের ১ হেক্টরের (৭.৪ বিঘা) কম জমি — তা ০.০১ হেক্টর বা এক–দু কাঠাও হতে পারে — তাদের হাতে রয়েছে মোট চাষের জমির ৭৭%; ১–২ হেক্টর (৭.৪–১৫ বিঘা) জমির মালিক ছোটো চাষিদের হাতে রয়েছে আরও ১৫%। অতএব সবুজ বিপ্লবের ক্ষেত্র অন্যান্য রাজ্যের মতো বড়ো চাষিদের মাধ্যমে নয়, পশ্চিমবঙ্গে ধান চাষ ও তার ফলনের পরিবর্তন হয়েছে ছোটো জোতের মাধ্যমেই।

এইসব তথ্য পেশ করা হল বটে। কিন্তু আমাদের সমীক্ষা কখনই এইসব তথ্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। কারণ সরকারি তথ্য ও পরিসংখ্যানের মধ্যে যে গড়পড়তা হিসেব নেওয়ার প্রবণতা থাকে, তাতে বাস্তব অবস্থার অনেক দরকারি খুঁটিনাটি বিষয় আড়াল হয়ে যায়। তাই সমীক্ষার পরিসংখ্যানগত ফলাফল পেশ করার পরে আমরা আমাদের কাজের অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়গুলিকে আলাদাভাবে উল্লেখ করব।

ধান চাষ : বোরো

আমরা আগেই বলেছি, প্রধানত বৈশাখী বা গ্রীষ্মকালীন ধানকে বোরো বা বোড়ো বলা হয়। আমন চাষ যেমন প্রধানত প্রকৃতি বা বর্ষার জল নির্ভর, বোরো চাষ কৃত্রিম উপায়ে ব্যবহৃত ভূগর্ভস্থ জলের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। অর্থাৎ জলসেচের ব্যবস্থা না করতে পারলে বোরো চাষ করার উপায় থাকে না। এছাড়া রয়েছে জল, রাসায়নিক সার, কীটনাশক এবং বীজের জন্য টাকার জোগানের প্রয়োজন। সেদিক থেকে বোরো চাষে সবাই যায় না। সাধারণত কার্তিক মাসের গোড়ায় বীজতলা করে মাঘের গোড়ায় ধান রোয়া হয়। ফসল ওঠে বৈশাখের মাঝামাঝি।

প্রথমে পরিসংখ্যানগত ফলাফলগুলি দেখা যাক।

পূর্ব মেদিনীপুর

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুর থানার আড়গোয়াল পঞ্চায়েতের ইচ্ছাবাড়ি গ্রামে যারা এবছর বোরো চাষ করেছে, তাদের মধ্যে বিষ্টু জানা, গৌতম মহাপাত্র এবং কবীন্দ্র মহাপাত্রের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি। চাষের কাজ এবং খরচের প্রতিটি হিসেব যিনি লিখে রেখেছেন যত্ন নিয়ে, সেই কবীন্দ্র মহাপাত্র প্রায় ভূমিহীন, সামান্য ২৫–৩০ ডেসিমেল (৫৩ ডেসিমেল = ১ বিঘা) জমি তাঁর। তিনি ভ্যানরিকশা টানেন আর পাওয়ার টিলার ভাড়ায় খাটান, রেট ২১০ টাকা ঘণ্টা। তাতে ২ লিটার ডিজেল লাগে, খরচ ৯০ টাকা। ড্রাইভার দিয়ে চালালে ঘণ্টায় ৪০ টাকা দিতে হয়। সিজনে ভাড়া ৩০০–৪০০ টাকাও ওঠে।

কবীন্দ্র মহাপাত্র ভাগে নিয়ে ৪ বিঘা ১৬/১৭ কাঠা জমিতে বোরো চাষ করেছেন। নিজের সামান্য ২৫–৩০ ডেসিমেল জমিতে বোরো ধান হয় না। ১৩ কেজি এন শংকর ধানের বীজ ২৬০ টাকা দিয়ে কিনে বীজতলা করেছেন ৩ ডেসিমেল জমিতে। তাঁর নিজের পাওয়ার টিলারে পয়সা লাগেনি। (অন্যদের বীজতলার নিচু জায়গার জমিতে লাঙল দিতে খরচ হয়েছে ৪০ টাকা।) সার লেগেছে ডিএপি দেড় কেজি ৩৬ টাকা, ১ কেজি করে ইউরিয়া দু–বারে ২ কেজি ১৯ টাকা, ফাইটার ওষুধ ১ বার ২০ টাকার, কন্ট্রাপ্লাস ১০ টাকা, রোগের ওষুধ ১০ টাকা। জল লেগেছে ৬০ টাকার। মোট ৪৩৭ টাকা খরচ হয়েছে বীজতলার জন্য।

বিঘাপ্রতি রোয়ার সময় ফিতাকাটা আর আলের জন্য ১টা হাজিরা লেগেছে ২৪০ টাকা। লাঙল নিজের, না হলে দুটো চাষে ৫৬০ টাকা খরচ। মাটি সাইজে ১টা হাজিরা, মই দিতে ১টা হাজিরা লাগে। তবে তিনি নিজে করেন। সার বিঘাপ্রতি ডিএপি ৪৫ কেজি ৯৮৫ টাকা, জৈব ৫০ কেজি ২২০ টাকা, পটাশ ২০ কেজি ৩২০ টাকা, ইউরিয়া ৪০ কেজি ৩৬০ টাকা লেগেছে। কীটনাশক বিঘাপ্রতি লেগেছে জলীয় ফাইটার দুবারে ৫০ এমএল ২০৩ টাকা, কন্ট্রাপ্লাস দুবারে ১৬৩ টাকা, দানা ওষুধ কোরাজিন ২ কেজি ৩০৪ টাকা, ভিটামিন ৭৫ টাকা।

রোয়ার সময় বিঘা প্রতি ৬টা হাজিরা সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত ১৬০০ টাকা। আগাছা বাছা ২টো হাজিরা ৪০০ টাকা। ঘাষের ওষুধ ম্যাচোটি ২০০ গ্রাম ১০০ টাকা, ওটা নিজে দেন, নাহলে ২টো হাজিরা লাগে। জল লেগেছে মিনি ডিপের থেকে ২১০০ টাকা বিঘা।

বৈশাখের ৮ থেকে ১৫–২০ তারিখ পর্যন্ত ধানকাটা হয়েছে। ধান দাঁড়িয়ে থাকলে ৪টে হাজিরা, শুয়ে থাকলে ৬টা হাজিরা। এইসময় লোকের চাহিদা বেশি, মেঘের দিনে আরও বেড়ে যায়। হাজিরা বেড়ে হয় ২৫০ থেকে ৩০০ টাকা।

ধানের ফলন হয়েছে বিঘায় ৩০–৩২ মণ। প্রথম যে কাটে সে ধানের দাম পেয়েছিল ৮৪০ টাকা/বস্তা। তারপর যখন বেশ ভালো পরিমাণ কাটা হল, এন শংকরের দর দাঁড়াল ৭২০–৭৫০ টাকা। সুপার শংকরের দর ৯০০ টাকা। তিনবছর আগে বন্যার জন্য লোকের ঘরে ধান রাখার জায়গা নেই।

ভাগে জমির মালিককে বিঘাপ্রতি ৫–৬ মণ দিতে হয়। (আমনে আধাআধি ভাগ। আমন চাষ তিনি ভাগে পান না। জমির মালিকরা নিজেরাই চাষ করে। ২০০০০ টাকা দিয়ে আগে থেকে জমি বুক করতে হয়।) ভাগের ধান মেটানোর পর খোরাকির জন্য রাখতে হয়। মাসে মুড়ি আর ভাতের জন্য ৭০–৭২ কেজি চাল লাগে ৪ জনের সংসারে, অর্থাৎ আড়াই মণ ধান। ধারদেনা মিটিয়ে সারা বছরের খোরাকি হয় না। বাজার থেকে কিছু কিনতে হয়।

বিষ্টু জানা ২ বিঘা ১৭ কাঠায় বোরো চাষ করেছেন। ২ বিঘায় সুপার শংকর, ১৭ কাঠায় এন শংকর। এর মধ্যে ১ বিঘা ৪ কাঠা ভাগে। ১ বিঘার জন্য দিতে হবে ২২০০ টাকা, ৪ কাঠার জন্য ৪০ কেজি ধান। এবছর তাঁর বিঘা প্রতি ৩০ মণ ধান হয়েছে, গতবছর হয়েছিল ২৮ মণ। বৈশাখে প্রথম যখন ধান উঠল, তখন রেট ছিল সুপার শংকরের ৯৭০–৯৮০ টাকা বস্তা (৬০ কেজি)। এখন রেট ৯০০ টাকা আর এন শংকর ৭৬০ টাকা। গতবছর আশ্বিন–কার্তিক মাসে সুপার শংকর ধানের রেট ১২০০ টাকা আর এন শংকর ধানের রেট ৯০০ টাকা উঠেছিল। রেট উঠবে এই আশায় এই বছর ধান বাড়িতে রেখেছেন তিনি। তাছাড়া এন শংকর ধানের মোটা চালটা বাড়িতে খাবার জন্য রাখা হয়।

প্রান্তিক চাষি গৌতম মহাপাত্র ১২ কাঠা নিজের জমিতে আর ১০ কাঠা ভাগে, মোট ২২ কাঠা (১ বিঘা ২ কাঠা) জমিতে এন শংকর বীজের বোরো চাষ করেছেন। বিঘাপ্রতি ভাগের জন্য ৩০০০ টাকা, অর্থাৎ ১০ কাঠার জন্য ১৫০০ টাকা দিতে হবে। বিঘাপ্রতি ৩৩ মণ ধান হয়েছে। খোরাকির জন্য অর্ধেক রেখে বাকিটা তিনি বিক্রি করেছেন ধান ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ৭৫০ টাকা বস্তায়। কারণ মহাজনের কাছ থেকে সুদে ১০০০০ টাকা লোন নিয়েছিলেন। ১০০০ টাকার ওপর ৩০ টাকা মাসিক সুদ। ৫ মাসে সুদ মোট ১৫০০ টাকা। ধান বিক্রি করে ৮০০০ টাকা শোধ করেছেন। বাকিটা পরে গতর খেটে শোধ করতে হবে।

এবছর ইচ্ছাবাড়িতে সর্বোচ্চ ফলন হয়েছে বিঘেতে ৩৫ মণ। এবছর কারেন্টের জল পাওয়ায় ৭৫% জমিতে বোরো চাষ হয়েছে। গতবছর হয়েছিল ৫০% জমিতে। ধান ভালো হয়েছে। অতীতে মাঠে জলের স্তর নেমে যাওয়ায় শ্যালো টিউবওয়েলে জল তুলতে অসুবিধা হচ্ছিল। ডিজেলের দাম বেড়ে যাওয়াতেও বোরো চাষ কমে গিয়েছিল। গতবছর পর্যন্ত কারেন্টের জল ছিল না। বিঘাপ্রতি মিনিভাড়া ছিল ৭০০ টাকা আর ডিজেলের খরচা ছিল চাষিদের। জলসেচ করার সময় তেল আনতে হত। বীজতলার ১ মাস, মাঠে ৩ মাস, এই ৪ মাস সময়ের মধ্যে পৌষে জলসেচ লাগত ৪টে, মাঘে ৫টা, ফাল্গুনে ৬টা, চৈত্রে ৭টা পর্যন্ত। যাদের পয়সার অভাব, কম সেচ দেয়। এতগুলো সেচ দিতে পারে না। তার ফলে ফলন কমে যেত। ফুল সেচ দিতে পারলে ধান হত ৩০ মণ, কম সেচে হত ১৮–২০ মণ।

গ্রামে বিদ্যুৎ আসার পর এবছর মিনি ডিপটিউবওয়েল বসিয়ে ভূগর্ভের জল তোলার ব্যবস্থা হল। আঞ্চলিকভাবে ঘোষণা হয়েছিল

বিঘাপ্রতি ১৮০০ টাকা জলের জন্য চাষিদের দিতে হবে। কিন্তু মিনি ডিপটিউবওয়েলের মালিকেরা সেই রেট মানেনি। তারা আন্দোলন করে রেট বাড়িয়ে নিয়েছে ২১০০ টাকা। ৫৩ ডেসিমেলে বিঘা ধরে ২১০০ টাকা, ৪৬ ডেসিমেলের বিঘার জন্য সেই অনুপাতে ২১০০ টাকার কম। আগামী ১০ আষাঢ় (২৫ জুন) মিনিসেট-মালিকের বাড়িতে নিমন্ত্রণ। সেদিন যার যা প্রাপ্য হয়েছে দিতে হবে। আগে চাষিরা কিছু অ্যাডভান্স পেমেন্ট করেছে।

উত্তর ২৪ পরগনা

উত্তর ২৪ পরগনার বাইগাছিতে দুজন, পুঁটিয়াতে দুজন, ভাতশালায় পাঁচজন, শগুনা পঞ্চায়েতের কপিলেশ্বরপুরের একজন এবং হাবড়ার বাণীপুর-মধ্যহারিয়ার একজনের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে।

বাইগাছির ভূমিহীন মাহাবুল হোসেনের চারজনের পরিবার। তিনি পাঁচজন কর্মী নিয়োগ করে রেডিমেড সেলাইয়ের কাজ করেন। অন্যের কাছ থেকে ২ বিঘা ১৫ কাঠা জমি নিয়ে বোরো চাষ করেছেন। লিজের মূল্য হিসেবে বিঘা প্রতি ২৪০০ টাকা দিতে হয়েছে। হাবড়া থেকে ৩০ কেজি মিনিকিট বীজ কিনেছেন ৩০ টাকা/কেজি দরে। লোক লাগিয়ে ট্রাক্টর আর জল ব্যবহার করে বীজতলা করতে ৩০০ টাকা খরচ হয়েছে। বিঘে প্রতি ধান রোয়ার আগে প্রথম কাদায় সুফল দেওয়া হয়েছে ২০ কেজি (১১ টাকা/কেজি), ফসফেট ২০ কেজি (৬ টাকা/কেজি)। এই সার ছেটানোর জন্য বিঘায় দেড়জন লেবার লেগেছে (১৩০+৬৫=১৯৫ টাকা)। ধান রোয়াতে বিঘা প্রতি ৫ জন লেবার লেগেছে। ২১ দিন পর ইউরিয়া লেগেছে ২০ কেজি (৭.৫০ টাকা/কেজি), ফসফেট ২০ কেজি আর পোকা মারতে ফোরেট লেগেছে ২ কেজি। এই কাজেও দেড়জন লেবার লেগেছে। তৃতীয় দফায় ইউরিয়া লেগেছে ৫-১০ কেজি। থায়ডন বিষ স্প্রে করতে হয়েছে ২৫০ মিলিলিটার, দাম ৮০ টাকা। ৩ বিঘা জমিতে একজন লেবার লেগেছে। অন্য লোকের ইলেকট্রিক পাম্প থেকে জল নিতে খরচ হয়েছে ১৫০০ টাকা/বিঘা। আল ছাঁটায় দেড়জন/বিঘা, আলের জল বন্ধ করতে ১ জন/বিঘা। দু-দফা নিড়ানির কাজে বিঘা প্রতি ৩ জন করে মোট ৬ জন লেবার লেগেছে। এরপর ফসল ওঠার পর বিঘা প্রতি কাটায় ৪ জন ও বাঁধায় ৩ জন ১৩০ টাকা করে, বওয়াতে ৪ জন ও ঝাড়ায় ৫ জন ১৪০ টাকা করে লেবার খরচ লেগেছে। চিটেপল ঝাড়ায় কুলোর বাতাস দিতে ১ জন লেবারকে ১০০ টাকা দিতে হয়েছে। মোট ৩১ বস্তা ধান হয়েছে। ফলনের মিনিকিট বিক্রি করেছেন। তাঁর ঘরে স্বর্ণমোটা চাল কিনে খান। ধানটা হাবড়া হাটে নিয়ে গেছেন, তাতে বস্তা প্রতি ২০ টাকা খরচ হয়েছে। হাটভাড়া লেগেছে ৫ টাকা/বস্তা। ১ মে ২০১২ দর ছিল ৭৩০ টাকা, জুন মাসে গুমা হাটে দর নেমে এসেছে ৬১০-৬১৫ টাকা/বস্তায়।

অন্যদের চাষের হিসেবপত্রে সামান্য হেরফের রয়েছে। বাইগাছির কালাম বিশ্বাস পুরুষানুক্রমিক চাষি পরিবার। তিনি আমন না করলেও আউশ এবং বোরো ধান চাষ করেন, পাটও করেন। পাট চাষ করার পর সেই জমিতে আউশে শতাব্দী মিনিকিট লাগান। সেই ফলনটা বীজতলার চারা হিসেবে বিক্রি করেন ৯০০ টাকা/বস্তায়, আবার নিজের বোরো চাষেও লাগে। তিন বিঘা জমিতে বাপ-বেটা নিজেরা খাটেন। বিঘে প্রতি ১২ বস্তা করে ৩৬ বস্তা ধান হয়েছে। তার মধ্যে ১৬ বস্তা খোরাকিতে যায়। শুধু চাষ করে সংসার চলে না। ছেলে গ্যারেজে খাটে। তবে বাজার থেকে কেনা চাল খান না। কপিলেশ্বরপুরের পঙ্কজ মণ্ডলের দুই ছেলে আরবে চাকরি করে, মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। বিলের তিন বিঘা জমি। আমনের সময় জলের তলায় থাকে, চাষ করা যায় না। জল নামলে ২ বিঘায় বোরো ধান আর ১ বিঘায় সবজি চাষ করেন। ১৩-১৪ বস্তা/বিঘা ফলন। ১ বিঘার ধানে খোরাকি মেটে, বাকিটা বিক্রি হয়। মধ্যহারিয়ার জগদীশ মণ্ডল প্রায় এক লক্ষ টাকা দিয়ে বন্ধকি জমি পেয়েছেন তিন বিঘা। দেড় বিঘায় গঙ্গাকামিনী করেছেন। নিজে অনেকটাই কাজ করেছেন। ১৩ বস্তা/বিঘা ফলনের সবটাই খোরাকিতে লেগে যায়।

পুঁটিয়ার কুতুবউদ্দিন মণ্ডল নিজের ১৩ বিঘায় শতাব্দী মিনিকিট চাষ করেছেন। পুরোপুরি চাষের ওপর নির্ভরশীল। ১৩ বস্তা/বিঘা ধান পেয়েছেন। ভাতশালার লিয়াকত আলি মণ্ডল ২ বিঘায় মিনিকিট চাষ করেছেন। পাড়ায় জ্যাঠার কাছ থেকে বীজ পেয়েছেন সামান্য সস্তায়। ফলন হয়েছে ১৪ বস্তা/বিঘা। ভাতশালার গোলাম হোসেন নিজের আধ বিঘার পাশাপাশি ভাগে তিন বিঘা চাষ করেছেন। চুক্তি ছিল ২ বস্তা/বিঘা দিতে হবে মালিককে। ভাতশালার মুসা করিম মণ্ডল ভ্যানচালক। ভাগে দশ কাঠা নিয়ে চাষ করেছেন, দিতে হয়েছে দেড় বস্তা অর্থাৎ ৯০ কেজি ধান। ভাতশালার জনমজুর খায়ের মণ্ডলও এক বিঘা জমি ভাগে চাষ করেছেন, মালিককে ৪ বস্তা ধান দিতে হয়েছে। ভাতশালার জাফর মণ্ডল জনমজুরি করেন, স্ত্রী সেলাইয়ের কাজ করেন। তাঁর দেড় বিঘায় শতাব্দী মিনিকিট চাষ করেছেন। ১৬ বস্তা ফলনের ধান পুরোটাই খোরাকিতে লেগে যায়।

বেড়গুম পঞ্চায়েতের কানাপুকুর দক্ষিণপাড়ার প্রভাত ঘোষ আগে বোরো চাষ করতেন। ওখানে ২-৩ জন বড়ো চাষির ২০ বিঘা করে জমি রয়েছে। এরা প্রথম ৩-৪ দিন সরকারি ডিপটিউবওয়েলের জলের লাইন আটকে রাখে। ফলে অন্য চাষিদের মাঠের চারা জল না পেয়ে শুকিয়ে যায়। গত দুটো মরসুমে সেই ছোটো চাষিরা মিলে মিটিং করে বোরো চাষ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

নদিয়া

নদিয়া জেলার বেতাইয়ে প্রান্তিক চাষি রামপদ বিশ্বাস বোরো চাষ করেছেন ১ বিঘা ৮ কাঠা জমিতে। তিনি এবং তাঁর বড়ো ছেলে নিজেরা খেটেছেন। তাঁর পুরো খরচটা ঠিকভাবে জানতে পাওয়া গেছে। তিনি অঙ্কের মিনিকিট বীজ কিনেছেন ১২ কেজি, ৩৫ টাকা/কেজি, মোট দাম ৪২০ টাকা। বীজতলা নিজেরা করেছেন। ডিএপি, পটাশ ও ইউরিয়া নিয়ে মোট ৮০-৯০ কেজি সার কিনেছেন বেতাই বাজার থেকে ১৫০০ টাকায়। দুবার কীটনাশক ব্যবহার হয়েছে, ১০০-১৫০ টাকা খরচ। সার আর কীটনাশক নিজেরাই জমিতে ছড়িয়েছেন। ধান রোয়ার সময় দুজন লেবার লেগেছে, খরচ ১২০ টাকা করে মোট ২৪০ টাকা, সঙ্গে নিজেরা দুজন। জমিতে লাঙলের চাষ দুবার দিতে ৩০০ টাকা করে ৬০০ টাকার লেবার লেগেছে, মই দিতে ২০০ টাকার লেবার। আগাছা নিড়ানির জন্য নিজেরা দুজন ছাড়া আরও ৪ জন, খরচ ১০০ টাকা করে ৪০০ টাকা। নিজেদের পাম্প থাকায় জলের জন্য শুধু তেল লেগেছে ৫০ লিটার, দাম ২২৫০ টাকা। জমি নিজেরাই দেখভাল করেছেন। ধান কাটার সময় নিজেরা ছাড়া ৪ জনকে দিতে হয়েছে ৪৮০ টাকা। আঁটি বাঁধার সময় একই রকম ৪ জনকে ৪৮০ টাকা দিতে হয়েছে। ধান

ঝাড়ার কাজ নিজেরাই করেছেন। ধান বয়ে বাড়িতে আনার সময় অবশ্য ৮ জন লেগেছে, ১৫০ টাকা করে ১২০০ টাকা দিতে হয়েছে। বিঘায় ২৫ মণ ধান হয়েছে, ১ বিঘা ৮ কাঠায় মোট ৩৫ মণ ধান হয়েছে। আটজনের পরিবারে পুরোটাই খোরাকিতে লাগে, বছরের শেষে আরও কিনতে হয়।

শান্তিপুরে সূত্রাগড় চর অঞ্চলের যে পাঁচজন প্রান্তিক চাষির সঙ্গে কথা বলা হয়েছে, তাঁদের জমি রয়েছে পরিবারপিছু দেড় থেকে তিন বিঘা। শান্তিপুর অঞ্চল বন্যাপ্রবণ হওয়ায় এখানে আমন চাষ হয় না। ধান চাষ বলতে বোরো চাষ। তাই এঁরা চাষের পাশাপাশি তাঁতের কাজ, কাপড়ে মাড় দেওয়ার কাজ এবং শেকড়-বাকড় বিক্রি করে সংসার চালান। শান্তিপুর, বর্ধমান ও হুগলির বাজার থেকে এঁরা বীজ কিনে আনেন। রত্না, মিনিকিট, ৪০৯৪ ধানের বীজ, মোটামুটি দর ৩০ টাকা কেজি। এক বিঘায় বীজের খরচ লেগেছে ৩৬০-৪০০ টাকা। ডিএপি (ডাই অ্যামোনিয়াম ফসফেট) সারের দাম ২০১০ সালে ছিল ৯২০০ টাকা/টন। ২০১১-১২ সালে দাম বেড়ে হয়েছে ২০,০০০ টাকা। সারে ভেজালও খুব বেশি হচ্ছে। এখানে সেচের জল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নদী সেচ প্রকল্পের রিভার-পাম্প থেকে পাওয়া যায়। কর বাবদ মাসে ২৫০ টাকা দিতে হয়।

এঁরা সার, কীটনাশকের মোট খরচ খুব স্পষ্টভাবে বলতে পারেননি। নিজেরা প্রত্যেকেই মাঠে খাটেন। তবু ধান রোয়ার সময় বিঘা প্রতি ৪-৫ জন লেবার লাগে। এখানে লেবারের মজুরি হল দৈনিক ১৫০ টাকা, সকাল ৭টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত তারা মাঠে কাজ করে। আগাছা তোলা, নিড়ানি ও ঘোলানির কাজে ৪টে লেবার লাগে। এদের মজুরি ১৫০ টাকা। তাই নিড়ানির কাজে ৬০০ টাকা খরচ। হ্যান্ড ট্রাক্টরে চাষ হয়, কখনো কখনো লাঙলও লাগে। চারটে চাষ দিতে ১২০০ টাকা খরচ। ধান তৈরি হয়ে গেলে কাটতে বিঘা প্রতি ৪ জন লেবার লাগে। এদের খরচ বেশি। গতবছর লেগেছিল ১৬০০ টাকা। ধানের আঁটি বাঁধাই করতে ২ জন লেবারকে ১৫০ টাকা করে দিতে হয়। ধান ঝাড়াই করতে ৪ জন এবং ঘরে তুলতে আরও ৪ জন লাগে। এদের জনপ্রতি মজুরি ১৫০ টাকা। এরপর রয়েছে ধান সেদ্ধ এবং অন্যত্র বয়ে নিয়ে ভাঙানোর কাজ। এতেও খরচ আছে। এঁদের ধান বেশিরভাগটাই খোরাকিতে লাগে। সামান্য দু-এক বস্তা ধান কারও কারও বিক্রি হয়। গতবছর বস্তাপিছু (৬০ কেজি) বাজারদর ছিল ৮০০ টাকা। এবছর দর ৬৫০-৭০০ টাকা। দাম কমেছে, অথচ চাষের খরচ অনেকটাই বেড়ে গেছে। এঁরা বলছেন, এভাবে খরচ বেড়ে গেলে আগামী বছর কীভাবে চাষ করব?

হরিপুর পঞ্চায়েতের সাহেবডাঙা মধ্যপাড়ার প্রান্তিক চাষি মহঃ সেলিম দেড় বিঘায় এবং ফরসাদ ধাবক তিন বিঘায় মিনিকিট চাষ করেছিলেন। এঁদের ধানের ফলন ভালো হয়নি। তিনবার ঝড় হওয়ায় ধান খুব চিটে হয়েছে। বিঘেতে ১০-১২ বস্তা ধান হয়েছে। সেটা খোরাকিতেই লাগে। চাষের জন্য লোন নেওয়ায় কিছু ধান বিক্রি করতে হয়েছে, দাম ৬৬০ টাকা/বস্তা। আগের বছর ছিল ৮০০ টাকা/বস্তা। ধানের পাশাপাশি এঁরা মুসুরি, ধনের চাষও করেন। মহঃ সেলিম তাঁতের কাজ করেন। ফরসাদ ধাবকের একটা ছোটো দোকান রয়েছে।

হরিপুর পঞ্চায়েতের সাহেবডাঙায় এঁদের পাশাপাশি মাঝারি চাষি আশরাফ ধাবক তাঁর ১৮ বিঘা জমির মধ্যে ২ বিঘায় মিনিকিট আর ২ বিঘায় নয়নমণি চাষ করেছেন, বাকিটায় অন্য রবিশস্য চাষ করেছেন; সিরাজুল ইসলাম ধাবক তাঁর ২০ বিঘার মধ্যে ৫ বিঘায় মিনিকিট করেছেন আর ১০ বিঘা লিজে দিয়েছেন। লিজ বাবদ তিনভাগের এক ভাগ ফসল পাওয়া যায়। গতবছরের তুলনায় এবছর ধানের দর প্রায় ২০০ টাকা কম। গত কয়েক বছর ধরেই সিরাজুল ইসলাম ধাবক মনে করছিলেন যে ধান চাষ (এখানে একমাত্র বোরো) আর লাভজনক নয়। তাই বাকি জমিতে অন্য রবিশস্য চাষ করছেন কিংবা লিজে দিয়ে দিচ্ছেন। আশরাফ ধাবক অবশ্য এরকম হতাশ নন।

নদিয়ার দিগনগর অঞ্চলে আমন আর বোরো দুটো চাষই হয়। মাঝারি চাষি নেপাল ঘোষ তাঁর ১৬ বিঘা জমির ১২ বিঘায় বোরো (মিনিকিট) চাষ করেছেন। তিনি বীজ কিছুটা বাড়িতে তৈরি করেছেন, বাকিটা কিনেছেন। বিঘাপ্রতি বীজের খরচ ২১০ টাকা। তিনি রাসায়নিক সারের পাশাপাশি প্রতি বিঘায় ৫-৬ মণ ঘরের জৈবসার ব্যবহার করেন। আগের বার ১২ বিঘায় ১৪৪ বস্তা ধান হয়েছিল, এবার হয়েছে ১৪৬ বস্তা। পরিবারের খোরাকির জন্য ৩০ বস্তা রেখে বাকিটা বিক্রি করেছেন। এখন দর চলছে ৭০০ টাকা/বস্তা। চাষের জন্য যাঁর কাছ থেকে টাকা লোন নিয়েছিলেন, তাঁর কাছেই ধান বিক্রি করেছেন। নেহাত তাঁর নিজের পাম্পসেট আছে, পরের থেকে জল নিলে চাষে লোকসান হয়ে যেত বলে নেপাল ঘোষ মনে করেন। আর এক মাঝারি চাষি বিপদ ভঞ্জন বিশ্বাস তাঁর ১৫ বিঘা জমির মধ্যে মাত্র ৪ বিঘায় মিনিকিট লাগিয়েছিলেন। তিনি রাসায়নিক সারের পাশাপাশি ২-৩ ট্রলি নিজেদের গোবর সার ব্যবহার করেছেন। এছাড়া লাঙল মই দিতে বিঘে প্রতি ৭৫০ টাকা খরচ হয়েছে। গত বছর ধান ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দর ছিল ৭০০ টাকা/বস্তা, পরে দর উঠেছিল ৮০০-৮৬০ টাকা। এবছর মোট ফলন হয়েছে ৫০ বস্তা। ভাবছেন, যখন দাম বাড়বে তখন বেচবেন। তবে বোরো চাষে উৎসাহ হারাচ্ছেন।অন্য চাষ ও বিকল্প রোজগারের কথা ভাবছেন। নির্মল সরকার তাঁর নিজের ৩ বিঘা জমির ২ বিঘে ১৫ কাঠায় মিনিকিট এবং ৫ কাঠায় তারামণি বীজ লাগিয়েছিলেন। ফলন হয়েছে বিঘায় মিনিকিট ১৪-১৫ বস্তা, তারামণি ১২-১৩ বস্তা। বেশিরভাগটাই তাঁর পরিবারের খোরাকিতে লেগে যায়। সামান্য বিক্রি করবেন। এখন দর হল মিনিকিট ৭৫০ টাকা/বস্তা, তারামণি ৬৫০ টাকা/বস্তা।

সুন্দরবন (দক্ষিণ ২৪ পরগনা

আয়লার আগে সোনাখালি-রামচন্দ্রখালিতে বোরো চাষ হত আমনের ৩০-৩৫% পরিমাণ; আয়লার সময় জমিতে নোনা ধরে যাওয়ার পর বোরো চাষ কমে ৫% হয়ে গেছে। সবজি চাষও কম।

সোনাখালির চরপাড়ার রাণী মুণ্ডার সঙ্গে কথা হয়েছে। বোরো চাষের জন্য পড়শির কাছ থেকে ৭০০ টাকা অগ্রিম দিয়ে এক বিঘা জমি নিয়েছিলেন, তার সঙ্গে নিজের ৫ কাঠায় ববি ধান লাগিয়েছিলেন। স্বামী-স্ত্রী দুজনে খেটেও পয়সা দিয়ে লেবার নিতে হয়েছে। পাকা ধান ওঠার মুখে বৈশাখের ৯ তারিখ শনিবার ১০-১৫ মিনিট শিলাবৃষ্টি হল। পরদিনই ধান কাটার কথা ছিল। শিলাবৃষ্টিতে ধান পুরো নষ্ট হয়ে গেল। প্রায় ২০০-২৫০ বিঘায় এইভাবে চাষিরা মার খেয়েছে।

রামচন্দ্রখালির জমাদারপাড়ার আব্দুল ওহাব জমাদার পরিবারের মুখ্য জীবিকা মাছ চাষ। নিজেদের তিন বিঘা এবং সরকারের কাছ থেকে লিজ নেওয়া ১০ বিঘায় তিনি মাছ চাষ করেন। তাঁদের ১৪ বিঘা একফসলি চাষের জমি, তাতে কেবল বর্ষার জলে আমন চাষ

হয়। বোরো চাষের জন্য অন্যের কাছ থেকে ১ বিঘা ২.৫ কাঠা ১০০০ টাকায় লিজ নিয়েছিলেন। সাদা মিনিকিট বীজ লাগিয়ে ধান হয়েছে মোট ১৩ বস্তা। কিন্তু বড়ো বড়ো শিলা পড়ে ধানের খুব ক্ষতি হল। যারা আগে কেটে মাঠে ফেলে রেখেছিল, তাদের ধান কম নষ্ট হয়েছে। যারা কাটতে পারেনি, তারা মার খেয়ে গেল। ওহাবউদ্দিন দুদিন আগে কেটে নিয়েছিলেন। এছাড়া নোনার সমস্যা তো আয়লার পর থেকেই চলছিল। এবছরও অনেকের বীজতলা নোনা লেগে খারাপ হয়ে গেছে। সব মিলিয়ে বোরোর ফলন ২০% হয়েছে, ৮০% মার খেয়েছে। ওহাবউদ্দিন নিচু জায়গা পেয়েছিলেন, জলের অভাব হয়নি। কাছাকাছি পুকুর আর খালবিলের জল পাওয়া গিয়েছিল। তাই ওই ধানটা পেয়ে খোরাকিটা ঘরে তুলে নেওয়া গেছে।

ওহাবউদ্দিন ধান বিক্রি করেননি। কিন্তু যারা ঘর থেকে ধান নিয়ে যায়, তাদের রেট ছিল বস্তা প্রতি বিধান–২ ৪৫০ টাকা, অন্নদা ৪৫০ টাকা, ববি ৫০০ টাকা, সাদা মিনিকিট ৭০০–৭২০ টাকা এবং লাল মিনিকিট ধান ৬৫০ টাকা।

আয়লার বছরে ওহাবউদ্দিন ৫ বিঘায় বোরো চাষ করেছিলেন। ওখানে গরমের এই চাষে জলের জন্য বিঘায় এক বস্তা করে ধান দিতে হত। সঙ্গে নিজের মবিল আর ডিজেল লাগত। পাঁচ বিঘায় পাঁচ বস্তা বা ২৫০০ টাকা ছিল জলের খরচ। সরকারি জল পেলে খরচ বেঁচে যেত। তবে ভূগর্ভস্থ জলের তুলনায় পুকুরের জলে ফলনটা ভালো হত। পাঁচ বিঘেতে ৭৫ বস্তা ধান হয়েছিল। আয়লার পর বোরো চাষ মারাত্মক কমে গেছে।

বীরভূম

থুপসাড়া পঞ্চায়েতের রোহিনীপুর গ্রামের তিনজন চাষির সঙ্গে আমরা কথা বলেছি। এঁদের মধ্যে কানন সাহার ৯ বিঘা জমির মধ্যে ৫ বিঘায় বোরো চাষ হয়েছে। তিনি আইআর ৩৬, দেশি ৩৬ বীজ ব্যবহার করেছেন। সাধারণত জমির ধানই বীজ হিসেবে ব্যবহার করেন। ২ জন লেবার আর নিজে বীজতলা করেছেন। লেবার খরচ পড়েছে ২০০ টাকা/বিঘা। সার হিসেবে দিয়েছেন নিজেদের গোবর সার আর ১০:২৬:২৬ সার ৪০ কেজি/বিঘা, ইউরিয়া ৩০–৪০ কেজি/বিঘা, পটাশ ৫ কেজি/বিঘা। কীটনাশক লেগেছে ৪০০ টাকা/বিঘা। সার আর কীটনাশক দিতে নিজের শ্রম ছাড়া বিঘেতে দুটো লেবার লেগেছে, খরচ ২০০ টাকা/বিঘা। ট্রাক্টর খরচ লেগেছে ৭৫০ টাকা/বিঘা। জমিতে নিড়ানির জন্য লেগেছে বিঘা প্রতি ২ জন, খরচ হয়েছে ১০০ টাকা/বিঘা। সাবমার্সিব্‌লের জলের খরচ হয়েছে ১০০০ টাকা/বিঘা। আল কেটে নিকাশির জন্য লেগেছে নিজের শ্রম ছাড়া ২ জন/বিঘা। ৯০ দিন পর ধান উঠেছে। ধান কাটার জন্য বিঘায় ৪ জন, আঁটি বাঁধার জন্য ৩ জন, ঝাড়ার জন্য ৩ জন আর তোলায় ২ জন, এদের মজুরি ২০০ টাকা করে লেগেছে। বিঘা প্রতি ১৬–১৭ বস্তা ধান হয়েছে। ১০ জনের পরিবারে খোরাকি লাগে ৬ মাসে ২৪ বস্তা। বাকি ৬ মাস আমনের ফলন (৯ বিঘায় আমন চাষ) থেকে আসে। বাকি ধান ঘরে আসা ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করেন। এবছর এখন পর্যন্ত দর ৪৮৫ টাকা/বস্তা, আগের বছর ছিল ৫৫০ টাকা/বস্তা।

সম্পন্ন চাষি মহঃ হানিফ ২০ বিঘায় বোরো (এমটিইউ ১০১০ বীজ) চাষ করেছিলেন। তাঁর ২৫ বিঘা জমি, পুরোটাতেই আমনের চাষ হয়। বিঘে প্রতি ৫০০–৬০০ টাকার বীজ কিনেছিলেন বাজার থেকে। তাঁর নিজের সাবমার্সিব্‌ল পাম্প আছে, ভাড়ায় খাটান (১০০০ টাকা/বিঘা)। বছরে নিজের ইলেকট্রিক খরচ ১৮০০০ টাকা। তাঁর ৭ জনের পরিবারে ৬ মাসের খোরাকিতে লাগে ১৮ বস্তা ধান। তিনি ভ্যানে করে ধান বাইরে ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করেন। গাড়িভাড়া লাগে ১০ টাকা/বস্তা।

সেখ গোলাম মুস্তাফা ১ বিঘায় নিজের ঘরের বীজ আইআর ৩৬ লাগিয়েছিলেন। তাঁর যা ফলন হয় পুরোটাই ৬ মাসের খোরাকিতে (৭ জনের পরিবার) লেগে যায়।

এবছর কালোবাজারির জন্য প্রথমে ১০:২৬:২৬ সার পাওয়া যায়নি। তার বদলে নানারকম পাইল করে বাজারে বিক্রি হয়েছে, যেটা ছিল ভেজাল। অন্য সারে গাছের ঝাড় হয়নি। পরে আবার বিঘা প্রতি ১০ কেজি করে ১০:২৬:২৬ সার এনে চাপান দিতে হয়। তাতে গাছের ঝাড় এলেও পাতা বেশি হয়ে যায়। ধানের ফলনটা কম হয়। গত বছরের তুলনায় বিঘেতে ১–২ বস্তা কম পাওয়া গেছে।

রোহিনীপুরে আমন ও বোরো ধানের পাশাপাশি আলু চাষও বেশ কিছুটা হয়। আমরা যাঁদের সঙ্গে কথা বলেছি, প্রত্যেকেই ধানের পাশাপাশি আলু চাষ করেন।

কোচবিহার

চকচকা অঞ্চলের ঝিনাইডাঙা গ্রামের গৌতম পণ্ডিত প্রবীণ চাষি, ৮৯ বছর বয়স। তিনি নিজের দেড় বিঘা জমিতে বোরো চাষ করেছিলেন। ১ বিঘায় হাইব্রিড ৯০০৯ এবং আধ বিঘায় আইআর ২৮। বাজারের ফার্টিলাইজারের দোকান থেকে ২৫০ টাকায় ১ কেজি হাইব্রিড বীজ আর ২৮ টাকা/কেজি দরে ৩ কেজি আইআর ২৮ কিনেছিলেন। বীজতলা নিজে করেছেন। বিঘে প্রতি সার কিনেছেন ডিএপি ২৪ টাকা/কেজি দরে ১৪ কেজি, পটাশ একই দরে ৭ কেজি, ইউরিয়া ৭ টাকা/কেজি দরে ৫ কেজি। ধান পুষ্ট হওয়ার জন্য জিঙ্ক দেওয়া হয়েছে ২ কেজি, দর ৬০ টাকা/কেজি। এর সঙ্গে গোবর লেগেছে বিঘায় ৭০০ কেজি। আগাছা নষ্ট করার জন্য কীটনাশক লেগেছে বিঘা প্রতি ২৫০ গ্রাম, দর ৫০ টাকা। পোকা মারার জন্য ফোরাডন লেগেছে ২ কেজি/বিঘা, দর ৬০ টাকা/কেজি। ধান রোয়ার সময় ১২৫ টাকা করে লেবার লেগেছে ৮ জন। ৩ ঘণ্টা ট্রাক্টর দিতে লেগেছে ১৮০ টাকা করে ৫৪০ টাকা। ভাড়া করা পাম্পসেট থেকে বিঘায় জল লেগেছে ৬০ টাকা ঘণ্টা হিসেবে ২৫ ঘণ্টা অর্থাৎ ১৫০০ টাকার। ধানের মুকুল আসার সময় বেবিস্টার স্প্রে করতে হয়েছে দু–বারে ১০০ গ্রাম, খরচ ১৭৫ টাকা। জমিতে রোয়া পোঁতা থেকে ধান পাকা পর্যন্ত সময় লেগেছে ১০৫ থেকে ১২০ দিন। ধান কাটার জন্য ৮ জন লেবারকে ২০০ টাকা করে ১৬০০ টাকা দিতে হয়েছে। ঝাড়াতে লেগেছে ৫ জন, খরচ ১০০০ টাকা। হাইব্রিড ধানটা হয়েছে ১ বিঘায় ২০ মণ আর অন্যটা আধ বিঘায় ৯ মণ। ২৯ মণই খোরাকিতে লেগে যায়।

চকচকা গ্রামের শ্যামলাল রাজভর পেশায় স–মিলের শ্রমিক। তিনি লিজ নিয়ে ১ বিঘা আর সিকি বিঘায় ২৯ ধানের বীজ চাষ করেছেন। বীজতলার জন্য রাখা ধান নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ৫০০ টাকার বীছন (কচি রোয়া ধান) কিনে লাগিয়েছিলেন। রোয়ার ২৫–৩০ দিনের মধ্যে তিনবার মাটি খামচে দিতে হয়েছে। এতে বিঘায় ৪টে করে লেবার লেগেছে, খরচ হয়েছে একবারে ১১০ টাকা করে ৪৪০ টাকা। দু–বার নিজেই করেছেন। ১৬ টাকা/কেজি দরে খইল দিয়েছেন বিঘায় ১৮ কেজি, খরচ ২৮৮ টাকা। চাপান সার হিসেবে ইউরিয়া দিয়েছেন

১০ কেজি/বিঘা, ১০ টাকা/কেজি দরে লেগেছে ১০০ টাকা; ১০:২৬:২৬ লেগেছে ১৫ টাকা/কেজি দরে ২০ কেজি আগাছা নষ্ট করার ওষুধ লেগেছে ২০০ টাকা/বিঘায়। ধান রোয়ার সময় মহিলা লেবার ৯ জনকে ১১০ টাকা করে মোট ৯৯০ টাকা দিতে হয়েছে। সার, কীটনাশক, ইউরিয়া নিজেই দিয়েছেন। জমি সমান করতে গরু হালে মই দিতে খরচ হয়েছে ২৫০ টাকা। ট্রাক্টর দিতে দুবারে মোট ৬ ঘণ্টার জন্য লেগেছে ২০০ টাকা/ঘণ্টা হিসেবে ১২০০ টাকা। অন্যের পাম্পের জল লেগেছে বিঘায় ৩০০০ টাকা। ধান তৈরি হয়ে যাওয়ার পর কাটার কাজে ৭ জন পুরুষকে ২২৫ টাকা করে আর মহিলাদের ১২০ টাকা করে মোট ১৯৩৫ টাকা দিতে হয়েছে। ধান ঝাড়ার মেশিন ভাড়া লেগেছে ৩০০ টাকা/বিঘা। তোলার জন্য ৪ জন পুরুষ ও মহিলাকে একই রেটে মোট ৬৯০ টাকা দিতে হয়েছে। শিলাবৃষ্টি হওয়ায় ফলন কম হয়েছে। ১ আর সিকি বিঘায় মোট ১৫ মণ। এর থেকে ৩ মণ লিজ বাবদ মালিককে দিতে হয়েছে। সংসারের খোরাকিটুকুই হয়।

গীতালদহ পঞ্চায়েতের খারিজা হরিদাস গ্রামের সেরাজুল হকের ৪৫ বিঘা জমি রয়েছে। এর মধ্যে ৪ বিঘা লিজে দেন। ১৭ বিঘায় আমন করেন। বোরো করেছেন ১৫ বিঘায়। বাকিটাতে সবজি, ভুট্টা, তামাক আর পাট চাষ করেন। ৬ বিঘায় হীরা আর ৯ বিঘায় ২৮ বীজ লাগিয়েছিলেন। বিঘা প্রতি বীজ কেনার খরচ ৩০০ টাকা। নিজের পাম্পসেট রয়েছে। সেটা ভাড়াও খাটান, ৪৫ টাকা/ঘণ্টা। বিঘে প্রতি ২৫–৩০ মণ হীরা, ২২ মণ ২৮ ধান হয়েছে। মাসে পরিবারের খোরাকিতে লাগে ১৪ মণ। বাকিটা বিক্রি করেন হাটের ঠিকাদারের কাছে। ১০ টাকা/মণ ভ্যান খরচ। দাম পেয়েছেন ৪০ কেজির বস্তায় ৩৬০ টাকা।

একই গ্রামের আবু মিঞা নিজের ২ বিঘা আর লিজে নেওয়া ৩ বিঘায় আমন আর বোরো দুটো চাষই করেন। বাংলাদেশের নানারকম বীজ বাড়িতে এসে বিক্রি করে যায়, তাতে খরচ পড়েছে ৬০০ টাকা/বিঘা। তাঁর এবছরে বিঘা প্রতি ২৫–৩০ মণ ধান হয়েছে। লেবারদের ১৫০ টাকা এবং খাওয়া দিতে হয়। মাসে তাঁর পরিবারের খোরাকি ৫ মণ আর লেবারদের জন্য ৩ মণ লাগে। ধান বিক্রি এখনও করেননি। গ্রামের হাটে দর এখন ৩২০ টাকা/মণ।

বর্ধমান

বর্ধমানে আমরা দুজন বড়ো চাষির সঙ্গে কথা বলেছি। মেমারির কুচুট গ্রামের দুলাল নন্দীর ৫ একর জমি। তার মধ্যে ২০–২২ বিঘায় এবছর বোরো করেছেন। ৮ বিঘায় মিনিকিট, ১২–১৪ বিঘায় আইআর ৬৪ লাগিয়েছিলেন। বোরোর বীজটা পান আউশের চাষ থেকে। ৩০ টাকা কেজি দরে সার্টিফায়েড বীজ কিনে বর্ষায় দেড়–দু বিঘা আউশের চাষ করেছিলেন। বিঘায় ৮–৯ কেজি লেগেছে। নিজের সাবমার্সিব্‌ল আছে। তাতে এখন ছ–মাসের ইলেকট্রিক বিল ১১,৫০০ টাকা। কিছুটা ভাড়া হয়। পুরো চাষে বিঘা প্রতি ৩২–৩৪টা লেবার লেগেছে, আমনের থেকে সামান্য বেশি। এবছর মাজরা পোকার প্রচণ্ড উপদ্রব। কৃষি বিশেষজ্ঞদের কাছে যাওয়া হয়েছিল। ওরা বলছে, আবহাওয়ার জন্য। রোয়ার পর ঠান্ডা ঠান্ডা ভাবটা রয়ে গিয়েছিল। বিঘে প্রতি ফলন কম হয়েছে, ৯–১০ মণ। অন্যদের আরও কম হয়েছে। আগে এর দেড়–দুগুণ ফলন হত। গত বছরও দেরিতে রোয়া হয়েছিল। খরচা এত, ধানের দাম নেই, কিছু চাষি একদম করেওনি। তিনি অল্প করে করেছিলেন, পনেরো বিঘে। পোকাও হয়েছিল। মিনিকিট হয়েছিল, ৬৪টা কিছুই হয়নি। এবছর রেট চলছে ৫২০–৫৪০ টাকা/বস্তা।

বর্ধমান–কাটোয়া রোডের ওপর ক্ষেতিয়া পঞ্চায়েতের মহাচান্দা গ্রামের এককালের জমিদার পরিবারের সদস্য দেবাশিস মণ্ডল সম্পূর্ণ লোক লাগিয়ে ২৭ বিঘায় মিনিকিট আর ১০৩৬। বোরো চাষ করেছিলেন। এখানে ওঁদের জ্ঞাতিদের মিলিয়ে এক লপ্তে ৪০ বিঘা চাষ হয়। এখানে একটু দেরিতে রোয়া হয়। মাটিতে বালির ভাগ থাকায় ফলন সামান্য কম হয়। বিঘাতে ১৪–১৫ মণ। যেখানে এঁটেল মাটি সেখানে ফলনটা ভালো হয়। স্থানীয় লেবারদের হাফবেলা কাজ, ৬০ টাকা রোজ আর দু–কেজি চাল। এবছর ফলন খারাপ হয়েছে। যারা ভাগে নিয়েছিল, তারা ভাগ মেটাতে পারছে না। বিঘায় ৪ বস্তা অর্থাৎ ৬ মণ ধান দিতে হয় ভাগচাষিদের। মালিকরা ৪ মণে রাজি, তাও পাচ্ছে না।

ক্ষেতিয়া পঞ্চায়েতের নবীনগর গ্রামের চাষি শেখ বরজাহান পনেরো বছর বয়স থেকে গরু–বাছুরের ব্যবসা করেন। ভূমিহীন অবস্থা থেকে ২ বিঘা জমি কিনেছেন। তিনি নিজের ২ বিঘায় এন–২ এবং ভাগে ১০ বিঘায় রত্না চাষ করেছেন। ভাগে বিঘে প্রতি ৪ বস্তা ধান দিতে হয়েছে। এছাড়া চাষের খরচ মেটাতে লোন নিতে হয়েছে। সেটাও ধান বিক্রি করে মেটাতে হয়েছে। হিসেব মতো ২ বিঘার পয়সাটা হাতে থাকে আর খোরাকি হয়ে যায়। খড়টা অবশ্য কাজে লাগে। খড়ের দাম বেড়েছে, ৪০০ টাকা কাহন।

সামগ্রিক পরিসংখ্যানের মূল্যায়ন

অন্য যে কোনো চাষের মতো ধান চাষ এক বহুবৈচিত্র্যময় কার্যকলাপ। ভূপ্রাকৃতিক গঠন, মাটি, জল, আবহাওয়া, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ধান চাষের প্রতিটি পর্যায়ে পরিসংখ্যানগত ভিন্নতা নিয়ে আসে। এক্ষেত্রে কোনো সাধারণ পরিমাপ শুধু অসম্ভবই নয়, অপ্রয়োজনীয়ও বটে।

এছাড়া, জমির মাপ আমরা বিঘায় পাই। ১ বিঘা জমি বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন মাপের। আমাদের সমীক্ষার এলাকাগুলিতে কোথাও তা ৩৩ শতক (ডেসিমেল), কোথাও ৪০, আবার কোথাও ৫৩, এমনকী ৬৪ শতক। পূর্ব মেদিনীপুরের ইচ্ছাবাড়ি গ্রাম সংলগ্ন একই চাষের এলাকায় বিঘার ৪৬ এবং ৫৩ শতক মাপ রয়েছে। এইসব জটিলতা মাথায় রেখে, বোরো ধান চাষের যে পরিসংখ্যানগুলি আমরা চাষিদের কাছ থেকে পেয়েছি, সেগুলিকে এখানে একত্রিত করা হল :

- **বীজের বৈচিত্র্য এবং দর** : একই অধিক ফলনশীল বীজ বছরের পর বছর ব্যবহার করায় ফলন কমতে থাকে। কৃষি বিশেষজ্ঞরা বীজ পাল্টানোর পরামর্শ দেন। চাষিরা নতুন কিছু করার ঝুঁকি নিতে ভয় পায়। তারপর কেউ নতুন বীজ ব্যবহার করে ভালো ফল পেলে অন্যরাও সেই পথে হাঁটে। সাধারণভাবে বীজতলার জন্য চাষিরা এন শংকর (মোটা), সুপার শংকর (ফাইন), মিনিকিট, রত্না, আইআর ৩৬, আইআর ৬৪, হীরা, গঙ্গাকামিনী, এমটিইউ ১০১০ ইত্যাদি আরও নানান বীজ ব্যবহার করেছে। আবার মিনিকিটের মধ্যে রকমফের রয়েছে — সাদা, লাল, শতাব্দী, অন্ধ্র ইত্যাদি। এগুলি বাজার থেকে চাষিরা কিনে আনে। এক বিঘা জমিতে ধান রোয়ার বীজতলা করার জন্য ৮ থেকে ১০ কেজি বীজ লেগেছে, দর মোটামুটি ২০ থেকে ৩৫ টাকার মধ্যে

ছিল। চাষিদের মধ্যেও কেউ কেউ আউশ ধান হিসেবে বীজধানের চাষ করেছে। সেই জমিতে আগে ধান চাষ করা যায়নি। পাট বা অন্য ফসল চাষের পর বীজধান চাষ করা হয়েছে। ঠিকমতো ধান পরিপক্ক এবং ঝকঝকে রঙ হলে তবেই তা বীজতলার জন্য কাজে লাগে। তবে এতে বাজার থেকে কেনা বীজের তুলনায় ফলন কম হয়নি।

- **বীজতলার সময় এবং খরচ** : বোরো চাষে সাধারণত কার্তিক মাসের গোড়ায় বীজ ফেলা হয়েছে। তলা হতে সময় লেগেছে এক মাস। বীজতলার বিঘা প্রতি ঠিকঠাক হিসেব করা মুশকিল। ট্রাক্টর, সার, কীটনাশক, জল সবই লেগেছে। কবীন্দ্র মহাপাত্রের প্রায় পাঁচ বিঘা (এখানে ৫৩ শতক = ১ বিঘা) জমিতে ধান রোয়ার জন্য ৩ শতক জমিতে বীজতলা করা হয়েছিল, মোট খরচ পড়েছে ৪৩৭ টাকা। নিজের পাওয়ার টিলার আছে। নাহলে আরও ৪০ টাকা যোগ হত। মাহাবুল হোসেন ২ বিঘা ১৫ কাঠায় (এখানে ৩৩ শতক = ১ বিঘা) ধান রোয়ার জন্য বীজতলা করেছেন, খরচ পড়েছে ৩০০ টাকা। সময় মতো বীজতলা না করতে পারায় চাষিরা দু-একজন চারাগাছ বা বীছন কিনে নিয়েছে। খরচ পড়েছে এক বিঘার জন্য ৫০০–৬০০ টাকা।
- **জমি তৈরির খরচ** : এখন মূলত ট্রাক্টর দিয়ে এই কাজ হয়। কোথাও কোথাও আংশিকভাবে লাঙলের ব্যবহার আছে। ২০০–২৫০ টাকা/ঘণ্টা পাওয়ার টিলার ভাড়া এবং দু-লিটার ডিজেলের ৯০ টাকা মিলে দু-বার চাষ দিতে ৬০০–৭০০ টাকা খরচ পড়েছে। হ্যান্ড ট্রাক্টরেও এরকমই খরচ লেগেছে। তবে কোথাও ৪টে চাষও লাগে। আংশিকভাবে লাঙল-মই দিতে বিঘা প্রতি ৭৫০ টাকা খরচ।
- **সার, কীটনাশক এবং ভিটামিনের খরচ** : বোরো চাষে সাধারণত আমনের তুলনায় এগুলি বেশি লাগে। তবে এর কোনো পূর্বনির্দিষ্ট সাধারণ পরিমাপ নেই। বাজার থেকে কেনা সারের গুণমান এবং দর সময় ও অঞ্চলভেদে ওঠানামা করে। ধানের খেতে পোকামাকড়ের উপদ্রবও একরকম হয় না। তবু বিঘা (৫৩ শতক) প্রতি একটা নমুনা হিসেব আমরা নেওয়ার চেষ্টা করেছি। ডিএপি ৪৫–৫০ কেজি ৯৮৫ টাকা, জৈব ৫০ কেজি ২২০ টাকা, পটাশ ২০ কেজি ৩২০ টাকা, ইউরিয়া ৪০ কেজি ৩৬০ টাকা লেগেছে। কীটনাশক লেগেছে জলীয় ফাইটার দুবারে ৫০ এমএল ২০৩ টাকা, কন্ট্রাপ্লাস দুবারে ১৬৩ টাকা, দানা ওষুধ কোরাজিন ২ কেজি ৩০৪ টাকা, ভিটামিন ৭৫ টাকা। সব মিলিয়ে লেগেছে ২৬৩০ টাকা।
- **জলের খরচ** : বোরো চাষ গ্রীষ্মকালীন চাষ। সাধারণত মাটির নিচের জল টেনেই এই চাষ হয়। জল কতটা লেগেছে? সাধারণত বীজতলার ১ মাস, মাঠে ৩ মাস, এই ৪ মাস সময়ের মধ্যে পৌষে জলসেচ লাগে ৪টে, মাঘে ৫টা, ফাল্গুনে ৬টা, চৈত্রে ৭টা পর্যন্ত। যাদের পয়সার অভাব, কম সেচ দেয়। এতগুলো সেচ দিতে পারে না। তার ফলে ফলন কমে যায়। পুরো সেচ দিতে পারলে ধানের উৎকর্ষ ও পরিমাণ দুই-ই ভালো হয়। শ্যালো টিউবওয়েল ব্যবহার করে ডিজেল লেগেছে বিঘা প্রতি প্রায় ৫০ লিটার, ৪৫ টাকা/লিটার দরে তেলের দাম ২২৫০ টাকা। এর ওপর রয়েছে শ্যালোর ভাড়া। যেখানে ব্যক্তিগত ইলেকট্রিক পাম্পসেটের ডিপটিউবওয়েল রয়েছে, সেখানে লেগেছে ঘণ্টা পিছু ভাড়া। কোচবিহারে ভাড়া ৪৫ থেকে ৬০ টাকা/ঘণ্টা, উত্তর ২৪ পরগনায় ১৫–১৮ টাকা/ঘণ্টা। আবার সকলে একরকম জলের ব্যবহার করেনি। কারণ ধানগাছের বাড় দেখতে হয় এবং নিজের আর্থিক সঙ্গতির প্রশ্নও রয়েছে। মোটামুটি ৫৩ শতকের বিঘায় ২০০০–৩০০০ টাকা এবং ৩৩ শতকের বিঘায় ১০০০–১৫০০ টাকা জলের খরচ। সুন্দরবনে খাল থেকে চায়না পাম্প ব্যবহার করে পাইপ দিয়ে জল আনা হয় জমিতে, খরচ ৫০ টাকা/ঘণ্টা। এছাড়া, যাদের নিজেদের সাবমার্সিব্‌ল পাম্প রয়েছে, ইলেকট্রিকের বিল বাবদ বছরে ১৮,০০০ থেকে ২০,০০০ টাকা মেটাতে হচ্ছে। তারা অবশ্য ভাড়া খাটিয়ে সেই টাকা উশুল করে নেয়।
- **লেবার খরচ** : ধান রোয়া এবং জমিতে ফিতে কাটা, আল দেওয়া থেকে শুরু করে লাঙল-মই দেওয়া, মাটি সাইজ করা, আগাছা বাছা, আল ছাঁটা এবং আলের জল বন্ধ করা পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে লেবার বা হাজিরা লাগে। সার, কীটনাশক ও ভিটামিন ছড়ানোর জন্য হাজিরা লাগে। ধান ফলানোর পর কাটা, আঁটিবাঁধা, তোলা, ঝাড়া পর্যন্ত ধাপগুলিতে হাজিরা লাগে। বর্ধমানের একজন সম্পন্ন চাষি বোরো চাষের লেবারের একটা মোট হিসেব দিয়েছেন, ৩৩–৩৪টা হাজিরা লাগে। যারা নিজেরা জমিতে কাজ করে এবং দেখভাল করে তাদের হাজিরা খাটানোর হিসেবে অনেক ভিন্নতা রয়েছে। তারা নিজেরা কী পরিমাণ কাজ করছে এবং সেই এলাকার হাজিরার সিস্টেমের ওপর এটা নির্ভর করছে। যেমন, এক-একটা কাজের জন্য খাটুনি এক-একরকম; হাফবেলা, পুরো দিনের সময়; এলাকাভেদে আলাদা আলাদা সময়সীমা; ধান কাটার সময় লোকের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় রেট বেড়ে যায়; মেঘলা দিনে এবং মাঠে ধান কী অবস্থায় রয়েছে সেই অনুযায়ী রেট ইত্যাদি। এছাড়া কিছু কিছু কাজে প্রান্তিক ও ছোটো চাষিদের মধ্যে পরস্পর একে অন্যের জমিতে খেটে দেওয়ার রীতিও রয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরের ইচ্ছাবাড়িতে লেবারের হাজিরার রেট ছিল ২৪০ টাকা, উত্তর ২৪ পরগনার বাইগাছিতে ১৩০ টাকা, নদিয়ার বেতাইয়ে ১২০ টাকা ও শান্তিপুরে ১৫০ টাকা, দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনে ১৫০ টাকা, বীরভূমের রোহিনীপুরে ২০০ টাকা, কোচবিহারে ১২৫ টাকা, বর্ধমানে ৮০–৯০ টাকা ও দু-কেজি চাল।
- **বিঘা প্রতি ফলনের পরিমাণ** : এবছর বোরো চাষে ফলনের পরিমাণ অনেক ক্ষেত্রে গত বছরের মতোই। আমাদের সমীক্ষা-এলাকার মধ্যে বর্ধমানের মেমারিতে ফলনের পরিমাণ বেশ কমেছে; মিনিকিট ধান হয়েছে বিঘায় ৯–১০ মণ, আগে এর দেড়-দুগুণ ফলন হত। বিপরীত চিত্র পূর্ব মেদিনীপুরের ইচ্ছাবাড়িতে। সেখানে ইলেকট্রিক লাইন আসাতে জলের সুবিধা পাওয়ায় বিঘায় এন শংকর ধানের ৩০ থেকে সর্বোচ্চ ৩৫ মণ ফলন হয়েছে। গত বছর ছিল ২৮ থেকে ৩০ মণের মধ্যে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমন শিলাবৃষ্টির জন্য সুন্দরবন এবং কোচবিহারে ফলন মার খেয়েছে। না হলে গড়পড়তা ১৮ থেকে ২৫ মণ ধান বিঘায় হয়েছে।
- **খোরাকির পরিমাণ** : একজন চাষি হিসেব দিয়েছেন, মাসে মুড়ি আর ভাতের জন্য ৭০–৭২ কেজি চাল লাগে তাঁর ৪ জনের সংসারে। আড়াই মণ অর্থাৎ ১০০ কেজি ধান থেকে ৭০–৭২ কেজি চাল পাওয়া যায়। সেই হিসেবে তাঁর পরিবারে বছরে ৩০ মণ ধান খোরাকিতে লাগে। আর একজন বলেছেন, তাঁদের ছ-জনের

পরিবারে মাসে ভাতের চাল ষাট কেজি আর মুড়ির চাল মাসে দশ–বারো কেজি লাগে। মুড়ি আর ভাত নিয়ে মাসে পঁচাত্তর কেজি চাল লাগে। এক বস্তায় থাকে ষাট কেজি ধান। তার থেকে চল্লিশ কেজি চাল হয়। মাসে দু–বস্তা ধান লেগে যায়। তাঁদের বছরে ২৪ বস্তা অর্থাৎ ৩৬ মণ ধান লাগে।

- **ভাগ ও লিজের শর্ত** : নদিয়ার কিছু এলাকায় তেভাগা রয়েছে, অর্থাৎ ফসলের তিনভাগের এক ভাগ জমির মালিককে দিতে হয়েছে। অন্যত্র ভাগ এবং লিজের শর্ত মৌখিক চুক্তির ভিত্তিতেই হয়েছে। আমনের তুলনায় বোরো চাষে ভাগে জমি পাওয়া সহজ এবং শর্তও তুলনায় ভালো। যেমন, পূর্ব মেদিনীপুরের ইচ্ছাবাড়িতে বোরো চাষ ভাগে নিলে বিঘা প্রতি ৫–৬ মণ ধান অথবা ৩০০০ টাকা দিতে হয়েছে, আমনে কিন্তু আধাআধি ভাগ। তাও পাওয়া যায় না, কারণ জমির মালিকরা অনেকেই আমনের চাষ নিজেরাই করে। আগে ভাগে জমি পাওয়ার জন্য ভূমিহীন বা প্রান্তিক চাষিরা তদ্বির করত। এখন বর্ধমানের মতো জেলাতেও বোরোর মরশুমে কিছু জমি খালি পড়ে থাকছে। অতএব চাহিদা অনুযায়ী ভাগ এবং লিজের শর্ত ওঠানামা করে। উত্তর ২৪ পরগনার পুঁটিয়ায় যেখানে ২ বস্তা/বিঘা দিতে হয়েছে, সেখানে ভাতশালায় ৪ বস্তা/বিঘা দিতে হয়েছে। কোচবিহারের চকচকা গ্রামে লিজের জন্য দিতে হয়েছে আরও কম, ১.২৫ বিঘায় ৩ মণ ধান। সুন্দরবনের সোনাখালির আদিবাসীপাড়ায় মাত্র ৭০০ টাকা দিয়ে ১ বিঘা জমিতে ভাগে বোরো করেছিলেন রাণী মুণ্ডা।
- **ধানের দর** : সাধারণত বৈশাখে যখন ধান উঠেছে, দর বেশ কম ছিল। গত বছরগুলির অভিজ্ঞতা অনুযায়ী চাষিরা মনে করে আশ্বিন–কার্তিক মাসে ধানের দর উঠবে। প্রথম কাটার দিন ধানের দর কিছু বেশি থাকলেও পুরো ধান কাটা হয়ে গেলে দর নেমে আসে। যেমন, ইচ্ছাবাড়ি গ্রামে প্রথম যে কেটেছে, সে পেয়েছে বস্তা পিছু ৮৪০ টাকা। কদিন পরে দর নেমে হল ৭২০–৭৫০ টাকা/বস্তা। চাষির আশা, দর আবার উঠবে। গত বছর আশ্বিন–কার্তিক মাসে এখানে ওই এন শংকর ধানের দর উঠেছিল ৯০০ টাকা/বস্তা। উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়া হাটে এবছর ১ মে দর ছিল মিনিকিট ৭৩০ টাকা/বস্তা, জুন মাসে ৬১০–৬১৫ টাকা/বস্তা। নদিয়ার শান্তিপুরে গত বছর দর ছিল মিনিকিট ৮০০ টাকা/বস্তা, এবছর এখন ৬৬০ টাকা/বস্তা; দিগনগরে দাম কিছু বেশি, ৭৫০ টাকা/বস্তা। সুন্দরবনে এখন সাদা মিনিকিট ৭০০–৭২০ টাকা/বস্তা, লাল মিনিকিট ৬৫০ টাকা/বস্তা। বর্ধমানেও এখন রেট কম, মিনিকিট ৫২০–৫৪০ টাকা/বস্তা। কোচবিহারে দর ৪৮০–৫৪০ টাকা/বস্তা। ভূমিহীন বা প্রান্তিক চাষিরা অনেকেই ঋণ নিয়ে চাষ করে, ফসল উঠলেই ধান অথবা টাকা দিয়ে শোধ দিতে হয়। ভাগে জমি নিলে, ভাগ মেটাতে হয়। ফলে তারা উঁচু দাম পাওয়ার জন্য ধান রেখে দিতে পারে না।

উপসংহার

১. চাষির কাছে ধান চাষ কতটা উপযোগী, এই প্রশ্ন সামনে রেখে আমরা সমীক্ষা চালিয়েছি। এই উপযোগিতা কথার অর্থ সমস্ত চাষির কাছে এক নয়। চাষির বাজার–নির্ভরতার মাত্রা ও ধরন অনুযায়ী চাষের উপযোগিতা ভিন্ন ভিন্ন। যেমন, একজন ভূমিহীন, জনমজুর বা প্রান্তিক চাষি বোরো চাষের মতো খরচবহুল চাষেও হাত দেয় কয়েকটা কারণে। প্রথমত, নিজের সামান্য জমি থাকলে বা আদৌ না থাকলেও বোরো চাষের জন্য ভাগে বা লিজে জমি পাওয়া সহজ; দ্বিতীয়ত, পরিবারের খোরাকি চালের সংস্থান হবে। কিন্তু যারা শুধু খোরাকির জন্য চাষ করেনি, কিংবা খোরাকির প্রয়োজন যাদের মুখ্য নয়, তাদের কাছে ধান বিক্রি করাই গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। সেক্ষেত্রে উপযোগিতার অর্থ দাঁড়াচ্ছে টাকার অঙ্কে লাভক্ষতি। আমরা আগেই দেখেছি, ১৯৬০–এর দশকের আগে সাধারণ (প্রান্তিক এবং ছোটো) চাষির কাছে, উপযোগিতার এই অর্থ ছিল প্রায় অনুপস্থিত। বোরো চাষের মধ্য দিয়ে অতীতের খোরাকির অভাব যেমন মিটেছিল, চাষ হয়ে উঠেছিল ক্রমাগত বাণিজ্যিক এবং বাজার–নির্ভর। কিন্তু ১৯৯০–এর দশকের পর এই বাণিজ্যিকীকরণের প্রক্রিয়ার গতি কিছুটা মন্থর হল, কারণ বোরো চাষের এলাকা আর তেমন বাড়ছিল না, সামগ্রিক ধানের ফলন বৃদ্ধির হারও মন্থর হতে থাকল।

২. জমির পরিমাণ দিয়ে যেভাবে চাষির স্তর ভাগ করা হয়ে এসেছে, তা দিয়ে চাষির অর্থনৈতিক অবস্থান বোঝা যাচ্ছে না। প্রথমত, প্রান্তিক চাষির জমির পরিমাণ ধরা হয়েছে ১–২ কাঠা থেকে ৭.৪ বিঘা (১ বিঘা = ৩৩ শতক ধরে নিয়ে)। কিন্তু বর্তমান চাষের উৎপাদনশীলতার দিক থেকে ৭ বিঘা জমি মোটেই কম নয়। সমস্ত জোগানের ব্যবস্থা করতে পারলে চাষি ধান বিক্রি করে ভালো পরিমাণ টাকা আয় করতে পারে। দ্বিতীয়ত, গ্রামে সাধারণত শুধু চাষের পেশায় কোনো পরিবার এখন নির্ভরশীল নয়। এই দ্বিতীয় বা তৃতীয় রোজগারের পরিমাণের ওপরও নির্ভর করছে, সে বোরো চাষের মতো খরচবহুল চাষে কতখানি খরচ করতে পারছে। বিপরীতে, সে যদি অভাবি হয় এবং টাকার অভাবে ঋণ নিয়ে চাষ করে, তাহলে ধান বিক্রি করে লাভ করার জায়গায় সে যেতে পারবে না অথবা পিছিয়ে থাকবে। গ্রামে যার অন্য কোনো মোটা আয় রয়েছে, সে ভাগে জমি চাষ করেও লাভবান হতে পারছে।

৩. শুধু খোরাকিই নয়, আগে ঘরের বা গোলার মজুত ধান বিক্রি করে পরিবারের লোক–লৌকিকতা, বিয়ে–থা, অসুখ–বিসুখের খরচ মিটত। ধান বিক্রি করে না হলে চাষি জমি বিক্রি করত। আমাদের সমীক্ষাতেও দেখা গেছে, চাষি জমি বন্ধক দিচ্ছে, অন্য কেউ সেই বন্ধকি জমিতে চাষ করছে। অর্থাৎ ধান ও জমি কেন্দ্রিক জীবনধারা সম্পূর্ণ মুছে যায়নি।

৪. আমাদের সমীক্ষায় দেখা গেছে, চাষিদের মধ্যে বিভিন্ন স্তরেই কিছু পরিবার রয়েছে, যারা চাষকে এখনও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখে। ভূমিহীন এবং নামমাত্র জমির মালিকদের মধ্যেও এরকম পরিবার রয়েছে। এদের অন্য কাজ বা আয় এত অনিশ্চিত ও অনিয়মিত যে চাষ করে যে ফসল তারা পায়, তাতে সারা বছর ভাতের জোগানটুকু অন্তত নিশ্চিত হয়। আমাদের সমীক্ষায় দেখা গেছে, যাকে গ্রামে ভ্যানচালক, মিস্ত্রি নামে ডাকা হচ্ছে, যার চাষি হিসেবে স্বীকৃতিটুকুও নেই, সে অত্যন্ত যত্ন নিয়ে চাষ করেছে। এদিক থেকে ধান চাষের (বোরো সমেত) এক ভিন্ন উপযোগিতা আমরা উপলব্ধি করি। ধান চাষে যুক্ত ৮০ শতাংশের বেশি প্রান্তিক ও ছোটো চাষিদের চাষের মধ্যে কোনো না কোনো মাত্রায় এই ভাতের জোগানের তাগিদ রয়েছে।

৫. আমাদের সমীক্ষায় দেখা গেছে, যে চাষি চাষ ভিন্ন অন্য পেশা এবং কাজকে অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে এবং অধিক সম্মানের মনে করছে, যে কিছুটা শহরমুখী হয়ে পড়েছে অথবা গ্রামে থেকেও শহুরে হয়ে পড়েছে, যে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বাজার-কেন্দ্রিক নানা চাহিদা তৈরি হয়েছে, যে পরিবারের কেউ কিছুকাল যাবৎ নিয়মিত ও নিশ্চিতভাবে অন্য রোজগার করছে, সে মূলত বাজারের লাভক্ষতির নিরিখে চাষের উপযোগিতাকে দেখছে।

৬. সাধারণভাবে আমাদের সমীক্ষায় এই ৪ ও ৫নং মনোভাবের মিশ্র অবস্থা এবং টানাপোড়েন চাষিদের মধ্যে দেখা গেছে।

৭. এমতাবস্থায়, অধিক ফলনশীল বীজের চাষ, সার ও কীটনাশকের অবাধ প্রয়োগ, খাল-বিল-পুকুর-ক্যানাল সহ ভূগর্ভস্থ জলের সঙ্কট, বিভিন্ন জেলায় জলে আর্সেনিকের দূষণ, চাষিদের আত্মহত্যা এবং সর্বোপরি সবুজ বিপ্লবের দীর্ঘমেয়াদি কুফল সম্পর্কে নানা রিপোর্ট চাষিমনে প্রভাব ফেলছে। চাষিরা নিজেদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তা মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করছে। তবে এই মুহূর্তে একটা হতাশার মনোভাবও বহু চাষির মধ্যে দেখা যাচ্ছে। বর্ধমানের মতো ধান ও আলু চাষে উন্নত জেলার বিভিন্ন এলাকায় বোরো চাষের সময় জমি খালি পড়ে থাকছে; অতীতে ভাগে নেওয়ার জন্য যে প্রতিযোগিতা ছিল, তাও স্তিমিত হয়ে এসেছে; বহু চাষের জমি বাস্তু, কলকারখানা বা অন্য কাজে বদল হয়ে যাচ্ছে।

এক বিকৃত শক্তিনীতি এবং পরমাণু বিদ্যুৎ ... ২ পৃষ্ঠার শেষাংশ

ভারতে পরমাণু বিদ্যুতের এই দশা হওয়ার পেছনে কিছু কারণ আছে। প্রথমত, ভারতে ইউরেনিয়াম প্রায় নেই। যাকে আমরা ইউরেনিয়াম বলছি, সেটাকে বাকি দুনিয়া তো ইউরেনিয়াম আকরিক বলেই মনে করে না। ভারতে এই ইউরেনিয়াম তৈরির জন্য যদুগোড়া বা অন্ধ্রপ্রদেশের কুডাপ্পাতে প্রচুর পরিমাণ টাকা খরচ করা হচ্ছে, ওখান থেকে পাওয়া এক ট্রাক ইউরেনিয়াম আকরিক থেকে তিনশো কি পাঁচশো গ্রাম মাত্র ইউরেনিয়াম পাওয়া যায়। আমরা ভাবছি, বিদেশ থেকে ইউরেনিয়াম আমদানি করব। পরমাণু চুক্তি-টুক্তি করা হচ্ছে। কিন্তু বিশ্বের সমস্ত পরমাণু চুল্লিগুলির জন্য যদি ইউরেনিয়াম লাগে, তাহলে প্রায় ৮৭,০০০ টন ইউরেনিয়াম লাগবে। আর বিভিন্ন দেশে তৈরিই হয় মোট ৬০-৬৫ হাজার টন ইউরেনিয়াম। ২০,০০০ টন ঘাটতি। এখন তাহলে কীভাবে চলছে? প্রথমত, এরা যতটা বলছে, ততটা পরমাণু শক্তি উৎপাদন হচ্ছে না। দ্বিতীয়ত, রাশিয়া আর আমেরিকাতে যে পরমাণু অস্ত্র বানানো হয়েছে, সেগুলি অকেজো করার পর তা থেকে পাওয়া খুব ঘন ইউরেনিয়ামকে কাজে লাগিয়ে সারা দুনিয়ার পরমাণু চুল্লি চলছে। আসলে কিন্তু ইউরেনিয়াম পৃথিবীতে অনেক আছে। ভারতেও আছে। তা আছে সমুদ্রে। কিন্তু তা খাতায় কলমে! সমুদ্র থেকে ইউরেনিয়াম নিষ্কাশন করে কাজে লাগানো অর্থনৈতিকভাবে মোটেই লাভজনক নয়।

এসব কথা যখন ওঠে, তখন আমাদের দেশের পরমাণু কর্তাব্যক্তিরা বলে, আমরা থোরিয়াম দিয়ে চুল্লি চালাব। থোরিয়াম আমাদের দেশে অনেক আছে। দুনিয়ার এক-চতুর্থাংশ থোরিয়াম আমাদের দেশে। কিন্তু বাস্তব হল, দুনিয়াতে কেউ থোরিয়াম থেকে বিদ্যুৎ এখনও বানাতে পারেনি। এর কিছু জটিল টেকনিকাল সমস্যা আছে। থোরিয়াম নিজে নিজে ভাঙে না (ফিসাইল নয়)। থোরিয়াম পরিবর্তিত হয়ে যায় ইউরেনিয়াম ২৩৩-এ। কিন্তু ওই রূপান্তরের সময় কিছু ইউরেনিয়াম ২৩২-ও তৈরি হয়, যা খুব শক্তিশালী গামা রশ্মি নির্গত করে। তাই যে জ্বালানিতে এই ইউরেনিয়াম ২৩২ থাকে, তাকে খুব ভালোভাবে ঢেকেঢুকে নিয়ে যেতে হয় বা রাখতে হয়। ল্যাবরেটরি মাত্রায় এই সবকিছুই সম্ভব। কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিয়াল মাত্রায় এত ঢেকেঢুকে জ্বালানি রাখার বন্দোবস্ত করা আমার মনে হয় অসম্ভব। অথচ আমাদের দেশের পরমাণু কর্তারা মনে করে তা সম্ভব। তাই আবার প্রশ্নটা উঠে যায়, এই বিদ্যুতের দাম কত হবে?

আরেকটা প্রশ্ন এসে যায়। আমাদের কতটা বিদ্যুতের দরকার, কুড়ি বা পঞ্চাশ বছর পরে? এটা কীভাবে হিসেব করা হয়? প্রথমে আমি ভাবতাম, এটা তো খুবই মুশকিলের কাজ। তারপর দেখলাম, আমাদের কর্তারা কীভাবে এটা করে। ওরা আমাদের দেশের জনসংখ্যা ও তার বৃদ্ধির হার হিসেব করে নেয়। তাতে ওরা দেখে, কুড়ি বছর বা পঞ্চাশ বছর বাদে জনসংখ্যা কত হতে পারে। তারপর ওরা দেখে এখন আমাদের দেশে বার্ষিক কত বিদ্যুৎ খরচ হয়, যা প্রায় ৮০০ কিলোওয়াট ঘণ্টা। ওরা বলে, এই ৮০০ কিলোওয়াট ঘণ্টা খুব কম। আমেরিকানরা তো ১৫০০০ কিলোওয়াট ঘণ্টা বিদ্যুৎ ব্যবহার করে। আমাদের যদি একটা উন্নত দেশ হতে হয়, তাহলে আমাদেরও ওই পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে হবে। অন্তত ৫০০০ না হলে ওদের সাথে এক সারিতে বসার যোগ্যই আমরা হব না! এবার নিজেদের মাথা থেকে বার করা ওই সংখ্যার সঙ্গে যে জনসংখ্যা ভবিষ্যতে হতে পারে, তাকে গুণ করে দিয়ে ওরা বের করে ফেলে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ বিদ্যুৎ চাহিদা। এভাবে যা খুশি সংখ্যা বানিয়ে দেওয়া যায়।

এবার আপনি যদি তর্ক জুড়ে দেন, এত বিদ্যুৎ যদি উৎপাদন করা হয়ও, তাহলেই কি সবাই বিদ্যুৎ পাবে? আজ এই যে সবার বিদ্যুৎ নেই, এর কুপ্রভাব আছে। এর ফলে কেরোসিনে ভরতুকি রাখতে হচ্ছে। না করলে এক তৃতীয়াংশ দেশবাসী অন্ধকারে থাকবে। কেরোসিনে ভরতুকি রাখলে ডিজেলেও ভরতুকি রাখতে হবে, না হলে লোকে ডিজেলে কেরোসিন মিশিয়ে দেবে, গাড়ির ইঞ্জিন খারাপ হবে। শক্তির চোখ দিয়ে আপনি যদি দেখেন, পেট্রোলের চেয়ে ডিজেলের শক্তি সামর্থ্য বেশি। তাই ডিজেলের দাম পেট্রোলের চেয়ে বেশি হওয়ার কথা। কিন্তু আমাদের দেশে ডিজেলের দাম পেট্রোলের চেয়ে অনেক কম। এই ভরতুকির জন্য লাভ কার হচ্ছে? খুব ধনীদের গাড়ির মডেল জাগুয়ার বিএমডবলুর এখন ডিজেলে চালিত গাড়ি বের করা হচ্ছে। এটা শুধু ভারতের জন্য। গরিবের নামে দেওয়া ভরতুকির লাভ তুলছে অতি ধনীরা।

এই চোখেই যদি আমরা সমস্ত শক্তি উৎসকে দেখি, যে সমস্ত উৎস ধনীরা ব্যবহার করে, ডিজেল, পেট্রোল, গ্যাস — সব কিছুতে ভরতুকি আছে। গরিবের শক্তি উৎস, কাঠকুটো, গোবর, খড় বা তুষ — কোনোটাতেই ভরতুকি নেই। আমাদের দেশে গরিবরা ধনীদের ভরতুকি দেয়। এর ফলে আমাদের শক্তি নীতিতেই গণ্ডগোল ও বিকৃতি তৈরি হচ্ছে।

চাষির অন্য চিন্তাভাবনা

নমুনা সমীক্ষা : পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ইচ্ছাবাড়ি গ্রামের জানা পরিবার

আমাদের গ্রামীণ ব্যবস্থার ভাঙন শুরু হয়েছিল দীর্ঘকাল আগে। কিন্তু তার নানান বৈশিষ্ট্য আজও নানান মাত্রায় টিকে রয়েছে গ্রাম–ভারতবর্ষে, গ্রামবাংলায়। এমনকী শহরেও তার ছাপ অল্পবিস্তর আমরা টের পাই। চাষির চিন্তাভাবনার জগৎ এই গ্রামীণ ব্যবস্থারই অঙ্গ। সেই চিন্তাভাবনার প্রকাশ ঘটে তার চাষ–বাসে। 'চাষের ওপর কোনো বাবু আর নির্ভরশীল নয়। প্রত্যেক লোকের ***অন্য চিন্তাভাবনা*** আছে।' জানা পরিবারের বড়ো ছেলে প্রদীপ জানার এই মন্তব্য থেকে আমরা এক চিন্তাভাবনা থেকে অন্য চিন্তাভাবনায় চাষির যাত্রাপথকে অনুধাবন করার চেষ্টা করি। সমগ্র চাষিসমাজেই এই বদল লক্ষ্যণীয়। তবে এখানে আমরা একটি পরিবারকে সমীক্ষার নমুনা হিসেবে নিয়েছি।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুর থানার আড়গোয়াল পঞ্চায়েতের মধ্যে ইচ্ছাবাড়ি গ্রামের পশুপতি জানা গত হয়েছেন বছর পনেরো আগে। তাঁর বড়ো ছেলে প্রদীপ কীভাবে কলকাতায় শ্রমিকের কাজ করতে এল? ওরই বয়ানে শোনা যাক।

চাষির ছেলে শ্রমিক হল

"আমার জন্ম ১৯৬৭ সাল নাগাদ। আমাদের ঠাকুর্দার পরিবারের হাতে জমি ছিল ২৪ বিঘা মতো। জ্যাঠামশাই, বাবা, মা সকলেই ছিলেন কংগ্রেস সমর্থক। আমাদের জ্ঞাতি ছিলেন বিমলকাকা, ওঁদের ৫–৬ বিঘা জমি ছিল। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে দেখছি, বিমলকাকা সিপিএম। আমাদের গ্রামে একজনের পরিবারের দু–তিনশো বিঘা জমি ছিল, হরিশচন্দ্র বেরা। পরে যখন বর্গা রেকর্ড হল, জমি তারা এর ওর নামে লিখিয়ে নিল। বাড়ির বাসন যে মাজত, হয়তো তার নামেও ১০ বিঘা লিখে দিয়েছিল। পরে সেই জমি ...।

প্রথমে বাবা ভর্তি করেছিলেন ইচ্ছাবাড়ি প্রাইমারি স্কুলে, তারপর ইচ্ছাবাড়ি কুঞ্জবিহারী হাইস্কুলে। জমিদারের জায়গার ওপর ছিল সেই স্কুল, ওদেরই পূর্বপুরুষের নামে স্কুলের নামকরণ হয়েছিল 'কুঞ্জবিহারী'। আমাদের গ্রামে ওরকম দেখেছি। যেমন, মন্দির পরিচালনার জন্য জমিদাররাই ৫০ বিঘা জমি ছেড়ে দিয়েছিল। ক্লাস সেভেনে ফেল করে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিলাম। দিদি কিন্তু ইলেভেন পাশ করেছিল, তারপর তার বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। জ্যাঠামশাইয়ের ছেলে পড়েছিল নাইন অবধি। আমার ভাইগুলোও ওইরকম, যে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করবে, সে তখন ঘরের কাজে খুব মন দেবে। বাড়িতে প্রথম প্রথম বকাবকি করবে, তারপর মেনে নেবে।

আমার যখন তেরো–চোদ্দো বছর বয়স, বাবা একটা লোকের সঙ্গে কথা বলে পাঠিয়ে দিলেন বারাসাতের নীলগঞ্জে ইটভাটায় বারোমেসে কাজে। ১৯৮১ সালে শুরু করলাম ইটভাটায় রান্নার কাজ। তখনকার দিনে দেখেছি, দুভাবে গ্রামের ছেলেরা কাজ পেত। এক, যে মেয়েরা বাবুর বাড়ি কাজে যেত, সেখানে পুরুষের সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক হলে সেই সূত্রে তার ছেলেকে কোথাও ঢুকিয়ে দিত; আর নয়তো বাচ্চা ছেলেরা কম মাইনেতে বাড়ির কাজ করতে করতে সেই বাড়ির কর্তার দয়ায় চাকরি পেত।

আমাদের গ্রামে একটা ছেলে ছিল, ওকে সবাই 'জামাই' বলে ডাকত। পোদ্দার কোম্পানির লেবার অফিসারের দাদা ছিলেন ডাক্তার, জিটি রোডে বাড়ি। তাঁর সুপারিশে জামাই পোদ্দারে ভর্তি হয়েছিল। আমার বাবা জামাইকে ডেকে বলল, তুই আমার ছেলের জন্য একটা কাজ দ্যাখ। ১৯৮৩ সালের শেষদিকে জামাই এসে বাবাকে একদিন বলল, প্রদীপকে পোদ্দারে (সুতাকলে) ভর্তি করে দেব, চার হাজার টাকা লাগবে। মায়ের আড়াই ভরির সোনার হার বিক্রি করে পাওয়া গেল সাড়ে চার হাজার টাকা। চার হাজার টাকা জামাইয়ের হাতে দেওয়া হল। বাবার কাছে থাকল পাঁচশো টাকা।

১৯৮৫ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি ভর্তি হলাম তারাতলা রোডে পোদ্দার প্রজেক্টে।"

কিন্তু প্রদীপের শ্রমিক–পরিচয় ওর জীবনে নিয়ে এল এক নতুন অনিশ্চয়তা। ১৯৮৮ সালে ওর মিলে (পোদ্দার প্রজেক্টে) সাত মাস লকআউট হল। ১৯৯২ সালে লকআউট চলল ১৪ মাসের ওপর। আর ১৯৯৭ সালের ১৯ জুন থেকে লকআউট হয়ে আজ অবধি চলছে। ১৯৮৬ সাল থেকে প্রদীপ নিজের ঘরেই অল্প দর্জির কাজ শুরু করেছিল। দর্জি–কাজ ছিল বলেই ওর পরিবার কোনোমতে বেঁচে গেল। স্বামী–স্ত্রী দুজনেই সেলাইয়ের কাজ করে এখন সংসার চালায়। প্রদীপ বলে, "আমাদের অবস্থাটা কেমন দাঁড়িয়েছে? এখানে একখানা ঘরে এক ছেলে এক মেয়ে আর বউকে নিয়ে আছি। বারবার লকআউটে অভাবের তাড়নায় দেশে চলে যাওয়ার কথাও ভেবেছি। ছেলে, মেয়ে বা বউ কেউই তা চায় না। দেশের বাড়িতে ঠাকুর্দার দুই ভাই মিলে ২৪ বিঘা জমি ছিল। দুই সংসার আলাদা হয়ে বাবারা দুই ভাই মিলে পেয়েছিলেন ১২ বিঘা। তারপর ল্যান্ড মর্টগেজে চলে গেল ২ বিঘা। বাবার ভাগে এল ৫ বিঘা। জ্যাঠার চার মেয়ে আর আমার দুই বোন, তাদের বিয়ে দিতে জমি বিক্রি করতে হয়েছে। এরপর আমাদের চার ভাইয়ের রয়ে গেছে মোট ৩ বিঘা। আমরা ভাইয়েরা মিলে আরও ১০–১৫ কাঠা কিনেছি। গ্রামের সম্পত্তি বলতে চাষের জমি, বাস্তু আর বাগান নিয়ে এতটুকুই। এতে চারটে আলাদা সংসার চলবে না। তাই মেটিয়াবুরুজেই আমাকে থাকতে হবে। মেয়েটা কলেজে পড়ছে, ছেলে একটা সামান্য কাজে ঢুকেছে। এখন রোজগার বলতে সেলাইয়ের কাজই ভরসা।"

তবু এখনও প্রদীপ মনেপ্রাণে গাঁয়ের ছেলে। গ্রামের বাড়িতে যেদিন যাওয়ার কথা থাকে, উত্তেজনায় আগের দিন রাতে ওর ঘুম হয় না।

শ্রমিক ফের চাষি হল

প্রদীপের মেজোভাই পীযূষ দাদার মতোই শহরে এসেছিল শ্রমিকের কাজে। পীযূষ দশ–বারো বছর কাজ করেছে হাওড়ায় বিস্কুট ফ্যাকট্রিতে। তারপর চাকরিতে রিজাইন দিয়ে চলে এসেছে। পীযূষ কেন গ্রামে ফিরে এল? প্রদীপ বলে, "পীযূষের শরীরটা ভালো নেই। বাচ্চাকাল থেকে ওর মেরুদণ্ডে একটা গণ্ডগোল আছে। ওজন–টোজন চাগিয়ে তুললে একটা যন্ত্রণা হয় কোমরে। তারপরে মোটরসাইকেল নিয়ে বাড়ির কাছে পড়ে গিয়েছিল। বড়ো ডাক্তার দেখানো হল। এক্স–রে করে ডাক্তার সাজেশন দিয়েছিল, রাত জেগে ডিউটি করতে পারবে না, ভারী কাজ করতে পারবে না। আর কোম্পানির যা ডামাডোল চালু হয়েছিল, ওভারটাইম না করে সিঙ্গল ডিউটিতে সংসার চালাতে পারবে না। তাহলে সেখানে পড়ে থাকবে কেন? আমাদের ফিশারির

কাজ চলছে। ফিশারিতে তো আট–দশ হাজার টাকা দিয়ে লোক রাখতে হয়। ফিশারি চারমাস চলে। অন্য সময় সে বাড়ির কাজকর্ম দেখাশুনা করছে, ধান কাটা, রোয়া সব কাজেই আছে।"

যৌথ চাষি পরিবার

প্রদীপ আজ পঁচিশ বছরের বেশি সময় ইচ্ছাবাড়ি ছেড়ে এসেছে। ছেলে–মেয়ে–বউ নিয়ে মেটিয়াব্রুজে ওর শ্বশুরবাড়িতে একটা ঘরে থাকে। অথচ ও মনে করে ওর বাড়ি ইচ্ছাবাড়ি গ্রামে। গ্রামের ভিটেয় মা আছে। সেজোভাই বিষ্টু পরিবার নিয়ে আছে। মেজোভাই পীযূষের পরিবার তো ছিলই, পীযূষও ফিরে এসেছে। ছোটোভাই পিনাকী সুরাতে কাঁচ ফ্যাকট্রিতে কাজ করতে গেছে আট বছর। কিন্তু ওর বউ এখানেই থাকে, একটা বাচ্চাও হয়েছে তার। এতগুলো মানুষের এক হাঁড়ি, একটাই রান্নাশাল। এতদিন সেজোভাই সংসার চালাত, আত্মীয়স্বজন কুটুমবন্ধু সব ম্যানেজ করত ও। পীযূষ এখন ঘরে চলে এসেছে। সে কন্ট্রোল করে। প্রদীপ আমাকে ওদের পরিবারের সিস্টেমটা বুঝিয়ে দেয় — "ধরো, আমি ইনকাম করি, তাই আমি আমার মতো করে শ্বশুরবাড়িতে যাব, সে চলবে না। তুমি শ্বশুরবাড়ি যাবে? ভালো কথা। তাকে ঘর থেকে পাঁচশো বা হাজার টাকা দেওয়া হল। ফলটল কেনাকাটা আছে, গাড়িভাড়া আছে। কী একটা শ্রাদ্ধবাড়িতে যাব। আমার আত্মীয়বাড়িতে আমি যাব, আমার পকেট থেকে যা ইচ্ছে ব্যয় করব, তা নয়। সেই টাকাটা ঘর থেকে যাবে। কিংবা তোমার আত্মীয়স্বজন এল, তাদের জামাকাপড় দেওয়া হবে। ঘরের লোক ঠিক করবে, কী দেওয়া হবে। মাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, সবার সঙ্গে বসে আলোচনা হয়, সেখান থেকে ডিসিশন হয়। এটা কিন্তু আমার বাবা–জ্যাঠার আমলেও ছিল। একটা আগাগোড়া ব্যাপার তো, অটোমেটিক শিখে যায়, বলতে হয় না। ১৬–১৭ বছর হল জ্যাঠাদের সঙ্গে বাবা আলাদা হয়েছে।

জ্যাঠা বেঁচে আছে, জেঠিমা বেঁচে আছে, অথচ তাঁদের দু–ছেলে আলাদা। আর আমাদের বাবা থাকতেও জয়েন্ট ফ্যামিলি একসঙ্গে ছিলাম, এখন বাবা নেই, এখনও একসঙ্গেই আছি। কোনো কোনো সময় বাড়ির মেয়েদের মধ্যে বা পুরুষদের মধ্যে অশান্তি হয়। কেমন অশান্তি হয়? ধরো মা রাগ করে খায়নি। কেন খায়নি? কথা বললে উত্তর দেয় না। হট করে আমাকে একটা ফোন করে দেয়। বা বউমার সঙ্গে মায়ের একটা তর্ক হয়েছে, আমায় ফোন করে। ফোন করলে ঘরে চলে যাই। সকলে বসে পড়ি। কার কোনটা ভুলত্রুটি হয়েছে, সবাইকে বুঝিয়ে দিয়ে চলে আসি। এ না যে হাড়ি–কাওড়াদের মতো মা–মাসি তুলে গালাগালি খিস্তাখিস্তি করব, সে জিনিস আমাদের ফ্যামিলিতে নেই।

ইচ্ছাবাড়িতে তিনশোর বেশি পরিবার। দু–চার বাড়িতে যৌথ পরিবার আছে। কিন্তু এদের উন্নতি ভালো। মনের দিক থেকে শান্তি থাকলে উন্নতিটা স্বাভাবিকভাবে হয়। টাকাপয়সা, সম্পর্ক সবটাই ভালো থাকে। আমাদের দেখে উদাহরণ দিয়ে আবার কেউ কেউ সেইভাবে চলে। তারা বলে, 'দেখে আয়, পশুপতি জানার ঘরে ছেলেরা কীভাবে একসাথে আছে? ওদের তো বাবা নেই!' আমার ছোটো ভগ্নিপোত আলাদা হয়ে গেছে ক্রিকেট খেলা নিয়ে। ক্রিকেট খেলার বাই। সারাদিন ক্রিকেট খেলা দেখতে চলে যাবে, খেলতে চলে যাবে। বিয়ে হয়েছে, ছেলেমেয়ে হয়েছে। সংসার? অন্য ভাইদের ওপর। ঠিক আছে বাবা, তোমার হাঁড়ি–কড়া আলাদা করো।

আমরা চারভাই তো চার রকমের আছি, চিন্তাভাবনা তো চার রকমের আছে। তা সত্ত্বেও একটা সমঝোতা করে আছি। আমি আমার মতো জীবনযাত্রায় আটকে থেকে পেরে উঠতে পারি না বলে তাই। তাও গত বছর ইধার–উধার করে ২৬০০০ টাকা দিয়েছিলাম ফিশারির জন্য। শালার ছেলের কাছ থেকে ধার নিয়েছিলাম। ছোটোভাই বছরে হোক, ছ–মাসে হোক, কোনো কাজ করতে গেলে একটা টাকা দেয়। মেজোভাই পীযূষ যখন চাকরি করত, হাতখরচা বাদে পুরো টাকাটাই দিয়ে দিত। সেজোভাই বিষ্টুর পুরো টাকাটাই ঘরে আসে। পীযূষের একটা প্রফিডেন্ট ফান্ড আছে। বিষ্টুকে বললাম, তুই যা আনছিস সে তো ঘরে ঢুকছে, ঘর থেকে তো আর বেরোচ্ছে না। ওর জন্য একটা লাইফ ইন্সিওরেন্স করে দেওয়া হয়েছে। তিনমাস অন্তর পাঁচহাজার টাকা করে দিতে হয়, দশ বছরের প্ল্যান। আজ সবাই একসঙ্গে আছে, কাল তো নাও থাকতে পারে। আগে ম্যাক্সিমাম ঘরে এরকম (যৌথ পরিবার) ছিল। কিন্তু বিশ্বাস যেখানে শেষ হয়ে যায়, সেখানে তো আর সম্পর্ক থাকে না। বাবা–মাও ভাগ হয়ে গেছে। আমার জ্যাঠামশাইয়ের ঘরে দেখেছি।"

বারোমাসের খোরাকি

প্রদীপ বলে, "১৬–১৭ বছর হল জ্যাঠাদের সঙ্গে বাবা আলাদা হয়েছে। জ্যাঠামশাইয়ের চার মেয়ে, দু–ছেলে। আমার বাবার দুই মেয়ে, চার ছেলে। টোটাল হিসেবে দুজনের একই আছে। জ্যাঠামশাইয়ের দু–খানা মেয়ের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরে সংসারটা আলাদা হয়ে যায়। জমি বিক্রির টাকা সম্বল, আর তো কোনো টাকা ছিল না। ১২ বিঘা জমি ছিল। বিক্রি করতে করতে ল্যান্ড মর্টগেজের টাকা দিয়ে সব শেষ হল। জ্যাঠামশাই বড়ো মেয়ের বিয়ে দিল এক বিঘা জমি বিক্রি করে। সেই সময় দাম ছিল সাড়ে চার হাজার টাকা। প্রথমে তাঁর বড়ো মেয়ে মেজো মেয়ে বড়ো ছেলের বিয়ে হল, তারপরে আমার বোনের বিয়ে হল। জ্যাঠামশাইয়ের ছেলের বিয়েতে নগদ টাকা না গেলেও পুকুরের মাছ জমির ধান তো কিছু গেছে। আমার তো নিজের মতো (নিজে দেখেশুনে) বিয়ে, দিতে হয়নি নিতেও হয়নি। বোনের বিয়ের সময় পাঁচ কাঠা জমি বিক্রি করে পাঁচ হাজার টাকা পাওয়া গিয়েছিল, বাদবাকি বাবা জোগাড় করেছিল। ছোটো বোনের বিয়ের সময় বাবার নিজস্ব যে জমি ছিল আর আমাদের ভাইদের কিছু জমি বিক্রি করে বাবা শূন্য হাত করে দিয়ে চলে গেছে। বাবা মারা যাওয়ার পর যা জমি ছিল (তিন বিঘা) তার ধানে সাড়ে তিনমাসের খোরাকি হত। আর বাদবাকিটা পীযূষ খেটে করেছে, পরে বিষ্টু করেছে। জমি আস্তে আস্তে বেড়েছে। এক–দু কাঠা, চার কাঠা করে গতর খাটিয়ে অন্য ইনকাম করে কেনা হয়েছে। এইভাবে দুজন ক্যাপচার করতে করতে আজকে সংসারটা এই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। ***এখন বারোমাসের ধান জমি থেকে উঠে যায়।***"

সাধারণ সম্পত্তি

প্রদীপ বলে, "জ্যাঠা–বাবার মধ্যে আইনগত কোনো ভাগ হয়নি। এটা একটু ভালো জমি, ভালো ফসল হয়, ওটা খারাপ। এটা ওরা নিয়েছে। অন্য জায়গায় আবার আমরা ভালোটা পেয়েছি। এইভাবে বোঝাপড়া করে মৌখিক ভাগ হয়। জমির একটা বাউন্ডারি আছে। ধরা যাক, এটা আঠারো কাঠা। লাইসেন্স–প্রাপ্ত আমিন দিয়ে মাপানো হয়। তাতেও যদি গণ্ডগোল হয়, কাঁথি থেকে স্ট্যাম্প মারা দাগি

মাল, সে কারো কথা শুনবে না, এরকম লোককেও নিয়ে আসা হয়। পুকুরটা একসাথেই আছে। মাছ ছাড়ার সময় আমাদের পঞ্চাশ টাকার ছাড়া হল তো জ্যাঠাবাবুদের পঞ্চাশ টাকার ছাড়া হল। এরকম (যৌথ) প্রপার্টি সব ঘরেই আছে। এরকম সাধারণ সম্পত্তি ইচ্ছাবাড়িতে নব্বই ভাগ ঘরে আছে। ধরো ভাগচাষ। দশ কাঠা জমি, চার ছেলে। এক-একজনের আড়াই কাঠা করে হবে। যা ফসল হবে চারভাগ হয়ে যাবে। গাছপালাও এরকম আছে।

পাঁচিল না থাকলে কী হবে? চুরি করে ধরা পড়লে মার হবে, জরিমানা হবে। মেয়েছেলে অন্যায় করলেও রেহাই নেই। তাদের মারটা তো বরদাস্ত করা যায় না। কিন্তু লোকে মেয়েদের দিয়েই মারাবে, পুরুষরা হাত দেবে না।"

চাষ-কেন্দ্রিক অতীত জীবন

প্রদীপ বলে, "আমার বাবাদের আমলে দেখেছি, ১২ বিঘা জমি ছিল, যা ফসলটা হল, সে হাঁড়িকুড়ি, তেলমশলা, ওষুধবিষুধ, কুটুমবন্ধু, যা লাগে, ওই ধান বিক্রি ছাড়া আর উপায় নেই। নাহলে জমি বিক্রি করতে হত। শেষ সম্বল জমি, আর তা বিক্রি করতেই হত।

আগে বাগানের পরিমাণ বেশি ছিল। সবজি হত। এই সময় দশ কাঠা জমিতে কচু লাগিয়ে দেওয়া হল। অঘ্রাণ-পৌষ মাস থেকে খোলা আরম্ভ হল। পৌষ মাসে আবার আলু বসে গেল। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাস পর্যন্ত সে আলুটা চলল। ১৫-২০ মণ আলু হল। এইভাবে চলত।

আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে চাষ হয়ে গেল, অঘ্রাণ-পৌষ মাসে ধান উঠবে। এই যে বর্ষাকালের সময়টা বাবারা কী করবে? মাঠে কাজ নেই, রাস্তায় বেরিয়েও কিছু নেই। পান্তা খাও, ভাত খাও। খেয়েদেয়ে কী করবে? ঘরে পাট থাকত, পাক দিয়ে দিয়ে দড়ি পাকানো হত। মাদুর তৈরি করা, খ্যাংড়াকাঠি দিয়ে ঝাড়ু তৈরি করা, হ্যাসাতি দিয়ে চাটাই তৈরি করা — ঘরে কাজ নেই কাজ নেই করেও অনেক কাজ আছে! কোন মাসে কোন সময়ে কী কাজ হবে, আগে থেকে একটা ছক তৈরি থাকত। মাদুর কাঠি কার্তিক মাসে হয়। মাদুরটা কাটা হয়ে যায় মাঘ-ফাল্গুন মাসে। কেটেকুটে তাকে গোছ করে রাখা আছে ওই নির্দিষ্ট সময়ে কাজের জন্য।

লোক-লৌকিকতা

প্রদীপের কোম্পানিতে লকআউট চলছে পনেরো বছর হয়ে গেল। ওর টানাটানির সংসার। তাই ও আক্ষেপ করে, "আমার একটা নিয়ম আছে। অভাব-অনটনের জায়গা থেকে পেরে উঠি না। গ্রামে গিয়ে ইচ্ছে করে, একটা চায়ের দোকানে বসব, একটা চা খেলাম বা একটা পান খাব। কিন্তু পাড়া-প্রতিবেশী আছে, আত্মীয়স্বজন আছে, একা তো খেতে পারব না। ট্যাঁকে তো ফুটারাম গোবিন্দ! সেই থেকে পাড়ায় গিয়ে আড্ডাবাজি লক্কাবাজি মারা একদম বন্ধ হয়ে গেছে। বাড়িতে বসে থাকি, তবু পাড়ায় যাই না। কুটুমবন্ধুর ব্যাপার আছে। ধরো বোনের বাড়ি যাব। বোনের বাড়ি এতদিন পরে যাচ্ছি, তাহলে তো এক কিলো মিষ্টি নিয়ে যেতে হবে। লৌকিকতা তো রাখতে হবে। সেটাও যদি না নিয়ে যাই, থোবরা দেখাতে যাব বোনের বাড়ি!

আমি যে বাড়িতে (ইচ্ছাবাড়ি গ্রামে) থাকি না, আমার মনে হয়, বাড়িতে চারটে ভাইপো আছে, ওদের জন্য চারটে জামাপ্যান্ট নিয়ে যাই, মায়ের জন্য দুটো শাড়ি নিয়ে যাই, বউমাদের জন্য দুটো সায়া-ব্লাউজ নিয়ে যাই। পেরে উঠি না সেকথা আলাদা। কিন্তু মাথায় থাকে। কিংবা এতদিন পরে যাচ্ছি, পাঁচ কিলো আম নিয়ে যাই।

যখন আমাদের আলু চাষ হত, আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে দিতে হত, তাদের বাড়ি থেকেও আসত। যেমন চৈত্র মাসে একটা ছাতু-সংক্রান্তি হয়। মুড়ি গুঁড়ো করে আর খেজুরের গুড় আর দুধ মেয়ের বাড়িতে যায়। বৈশাখ মাসে আম লিচু মেয়ের বাড়িতে দিতে যেতে হয়। পৌষসংক্রান্তি মেলা যখন বসে, যতরকম সবজি মেয়ের বাড়িতে যায়, আবার বউমাদের বাপের বাড়ি থেকে আমাদের বাড়িতে আসবে। এসব সামাজিক ব্যাপারগুলো এখনও কিছুটা আছে। কী করব? বাজার থেকে কিনেই পাঠাতে হয়। একটা সাধভক্ষণে আজকের দিনে ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা খরচা। *গ্রামের সামাজিকতার ব্যাপারগুলো খারাপ হলেও সবাই মানে, তাই আমি মানি।*"

এখনকার সবজি চাষ

প্রদীপ বলে, "আমাদের (চাষের) বাগানগুলোর চারধারে বড়ো বড়ো গাছ আছে তো। এত তলা অবধি শিকড়, মাটিটাকে অসাড় করে দিয়েছে। সবজি বসালে ভালো হবে না। ভিটের চারপাশে এই বর্ষার সময় হয়তো কিছু কুঁদলি হল, ঝিঙে, চিচিঙে হল। কি ফুটি হল। উঠোনটাতেই হয়ে যায়। তাতে কীটনাশকও লাগে না। হয়তো সার একটু লাগে। আগে সবজি হত, এখন বাজার থেকে কিনে নেওয়া হয়। জ্যাঠামশাইরা এখনও আলু, পেঁয়াজ, ধনেপাতা, চিচিঙে, ঝিঙে উচ্ছে, করলা সবই করে।

বিষ্টুর শ্বশুর বাদল গায়েন মাঠ থেকেই কালেকশন করে সবজি। যেটা পেল না, অথচ চাহিদা আছে, সেটা বাজার থেকে কিনে নিয়ে চলে এল। ও হাট থেকে এ হাটে নিয়ে চলে এল। আমাদের বাড়ি থেকে এক কিলোমিটার দূরে বুধবার আর শনিবার একটা হাট বসে। সেসব অঞ্চলে বালি টাইপের মাটি, যা লাগায় তাই হয়। মাটি এক কিলোমিটার এধারে ওধারে অনেক ডিফারেন্স। আবার আমার বাবার পিসিমার বাড়ি, আমাদের বাড়ি থেকে ৩-৪ কিলোমিটার একটু পশ্চিমে চলে গেলে, সেখানে কালো কুচকুচে মাটি, কিচ্ছু হয় না। সোনা দিলেও খার হয়ে যাবে। আমাদের বাড়ি থেকে দু-আড়াই কিলোমিটার দূরের জমিগুলোতে আলগুলো চওড়া। আষাঢ় মাসে যখন জল ধরে গেল, একটু কাস্তের ডগা দিয়ে খুঁড়ে খুঁড়ে চারটে করে ভেন্ডির দানা ফেলে দিয়ে চলে গেছে, তার মাঝখানে কচু বসানো আছে, আরামসে ভালো সবজি হয়ে যাচ্ছে।"

নতুন প্রজন্মের পরিযায়ী শ্রমিক

প্রদীপের ছোটোভাই পিনাকী আট বছর আগে সুরাতে চলে গেল। গ্রামের একজন ওখানকার কাঁচ কারখানায় কাজ করত। সে ওকে নিয়ে গেল সঙ্গে করে। তারপর একে একে দশ-পনেরোটা পরিবারের ছেলেরা গেছে। কেউ সপরিবারে চলে গেছে। গুজরাতের ওই অঞ্চলে মেয়েরাও কাজ পায়। কোনো কোনো পরিবারের মেয়েরাও কাজ নিয়েছে। ইচ্ছাবাড়ির তিন শতাধিক পরিবারের ৭৫% বাড়ি থেকে কেউ না কেউ এখন বাইরে কাজ করতে যাচ্ছে। কেউ যাচ্ছে আলুর লোডিং-আনলোডিংয়ের কাজে, কেউ বিস্কুট কারখানায়, কেউ সুরাতে। তবে নতুন প্রজন্মের এই ছেলেরা গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেনি।

বিষ্টু সবই করে

প্রদীপের মেজোভাই বিষ্টু। চার ভাইয়ের মধ্যে ও বরাবর গ্রামেই রয়ে গেছে। বিষ্টু আদতে একজন পাকা চাষি। প্রদীপ বলে, "বাঁচার স্বার্থে মানুষ কোনদিকে যাবে? সময়ই ঠিক করে দেয়, তোমাকে ওইদিকে

যেতে হবে। বিষ্টুর পিক–আপ ভ্যান আছে। যখন ডাক পেল, সেখানে ইনকাম করতে চলে গেল। দুগ্‌গাপুজোর আগে কিনেছে ঢালাই মেশিন, ছাদ ঢালাই হয়। মাঝখানে ওর পিক–আপ ভ্যানের ভাড়া হচ্ছিল না। দিন–কে–দিন গ্রামে পিক–আপ ভ্যানের সংখ্যাটা বেড়ে গেছে। বিষ্টু যেখানেই কাজ করুক না কেন, কাজের মতোই কাজটা করে। ওর চাহিদাটা প্রচুর। তা সত্ত্বেও এমন এক একটা সময় এসে যায়, তখন ভাড়া হয় না। কী করবে? আড্ডা মারতে মারতে ঠিক করল, একটা ঢালাই মেশিন কিনে ফেলি। ৬৫০০০ টাকা দিয়ে একটা সেকেন্ড হ্যান্ড ঢালাই মেশিন কিনে ফেলল। কেনার পর এবার লেবার লাগবে। লেবার–টেবার জোগাড় করে, তারপর বেলচা কড়া আছে, সব নিয়ে ...। বিষ্টু তিনখানা ভাড়া পায়। একটা পিক–আপ ভ্যানের, গাড়িতে ঢালাইয়ের মাল সব লোড করল, সেখানে ফেলল। মেশিনের একটা ভাড়া। সারাদিন কাজ করল তার মজুরি।"

আমি (সমীক্ষক) যখন ইচ্ছাবাড়িতে গেলাম, বিষ্টুর সঙ্গে আলাপ হল। দেখলাম, বিষ্টু একজন কর্মবীর। জমির মালিকানার মাপে বিচার করলে প্রদীপ–বিষ্টুরা ছোটো চাষি পরিবার। ওদের সাকুল্যে সাড়ে তিন বিঘা জমি। ছেলেপুলে নিয়ে ১২–১৩ জনের পরিবার। দুই দাদা আর এক ভাই যখন বাইরে চলে গেল, সংসারের দায়িত্ব বিষ্টুর ওপর পড়ল। ওকে অনেক কসরত করে এই যৌথ পরিবারের সংসারের হাল ধরে থাকতে হয়েছে। আমি ভাবছিলাম, বিষ্টু আমন আউশ আর বোরো তিনটে ধানের চাষ করে, নিজেদের জমির ওপর অন্যের জমি নিয়ে ভাগচাষ করে, পিক–আপ ভ্যান চালায়, ঢালাই মেশিন ভাড়ায় খাটায়, আবার ফিশারির বাগদা চিংড়ি চাষে নেমেছে — কী করে সামলায় এত সব? ওকে জিজ্ঞেস করলাম। বিষ্টু বলল, "প্রত্যেক বছর আমি আউশের চাষ করি না। আমি তো একা থাকি বাড়িতে, এরা সকলে ফাঁকে থাকে। আমি যখন সুযোগ পাই তখনই করি। ধরো এবছর মেজোভাইকে পেয়েছি, আমন চাষটা তুলে নিয়ে সরিষা দিয়ে দিয়েছি। সরিষাটা তুলে নিয়ে বোরোটা রোপণ করেছি। এইটা তুলব। সামনে ফিশারি আছে। ফিশারিটা যদি টাইম মতো উঠে যায়, তাহলে আমি আবার আউশে লেগে যেতে পারব। ভাবছি করব, নাও করতে পারি। গত সিজনে করিনি, তার আগের সিজনে করেছিলাম। বন্যার বছরে করেছিলাম। শতকরা ১০% লোক আউশ করে। বোরোটা ৮০% মানুষ করে।

আমি গতবছরের আগের বছর এক বিঘা জায়গায় আউশ করেছিলাম। আমার খরচা হয়েছিল ২০ কেজি ডিএপি, ২০ কেজি ইউরিয়া, লাঙলে ২ ঘণ্টা ৪০ মিনিট। বোরোর বীজটা নিয়ে আউশটা হয়। আউশের বীজটা নিয়ে বোরো হয়। শংকর ধান। আমনও ঘরের থেকেই করি। কোনো বছর হয়তো দুধেশ্বর আর পাটনি মিক্সড হয়ে গেছে, করলে লস হয়ে যাবে, আবার বীজভাণ্ডার থেকে কিনে নিয়ে আসি। ৩০ কেজি প্যাকেটের দাম ১২০০–১৪০০ টাকা। আবার কোনো সময়ে নিজের ধানটা পছন্দ নয়, আউশটা বিক্রি করে দিয়ে — আমারই কাছকাছি বাড়ির মধ্যে আমার ধানটা দিয়ে এলাম, ওনার ফ্রেশ ধানটা নিয়ে চলে এলাম। আউশে কীটনাশক, সার আর ভিটামিন খরচাটা কম, তিনটে চাষের মধ্যে বোরোর খরচ সবচেয়ে বেশি। আমার খরচ একটু কম হয়, কারণ আমি সরিষাটা চাষ করি। ওটার জৈবক্ষমতাটা প্রচুর থাকে।

আমি এবার সরিষা চাষ করেছিলাম দেড় বিঘায়। খরচা পড়েছিল — ১ বস্তা ডিএপি ৯০০ টাকা, ১ বস্তা ইউরিয়া ৫০০ টাকা। এবারে জলের খরচ, আমার নিজের মেশিন, আমি তেল কিনে নিয়ে এসেছি। দুটো সেচ করেছি, তাতে শুধু তেল খরচ হয়েছে। আমার তো কাউকে ভাড়া দিতে হয় না। নিজের পুকুরের জল। ক্যানেল থেকে একবার জল নিয়েছি। যেখান থেকে জলটা বের হচ্ছে, তার থেকে ১০০০ ফুট দূরে আমার সরিষাবাড়ি। ওখানে একটা সরকারি খাস জায়গায় নিকাশি আছে। সেখানে মেশিন নিয়ে গিয়ে জলটা দিয়েছি। তাতে আমার লস হয়ে গেছে। সামনে যে একটা ভারী বর্ষণ হল, সরিষাবাড়িতে জল ধরে গেল। আমন ধান কেটেছি, তার একটা রস জমিতে ছিল। সরিষাগাছ পাকার আগেই তো বৃষ্টি। ১ কুইন্টাল ২৫–৩০ কেজি মতো সরিষা আমি পেয়েছি। ১৪ ঘণ্টা আমি জল লাগিয়েছি দেড় বিঘায়। ভাড়ায় নিতে হলে ৬০ টাকা/ঘণ্টা দিতে হত। ৮৪০ টাকা ভাড়ার বদলে ১০ লিটার তেলে আমি চাষটা তুলে নিতে পেরেছি। ভাড়ায় জল নিতে হলে আমার লস এসে যেত। আমার মাথায়–মাথায় হয়েছে। ১ কুইন্টাল সরিষার দাম ৪০০০ টাকা, বর্তমান মার্কেটে ৪০ টাকা/কেজি। আমি ২৩০০ টাকা মতো খরচা করেছি।

এই সিজনে ২ বিঘা ১৭ কাঠায় বোরো চাষ করেছি। ২ বিঘায় সুপার শংকর, ১৭ কাঠায় এন শংকর। এর মধ্যে ১ বিঘা ৪ কাঠা ভাগে। ১ বিঘার জন্য দিতে হবে ২২০০ টাকা, ৪ কাঠার জন্য ৪০ কেজি ধান।

বোরো উঠলে আউশ। মন চাইলে করতেও পারি, নাও পারি। গতবছরের আগের বছর আমি আউশে ধান ভালো পাইনি। বন্যার জন্য। ১৭ কাঠায় পেয়েছিলাম ৮ মণ। বৈশাখে বীজতলা পড়ে গেল। জ্যৈষ্ঠতে রোপণ হল। ভাদ্রে ধান তুলেই সঙ্গে সঙ্গে লাঙল, সঙ্গে সঙ্গে আবার চাষ, আমন। সেটার ফলন হয় বিঘায় ১০ মণ করে। আউশের ধানটা তুলতে গিয়ে আমন বুনতে লেট হয়ে যাচ্ছে। তাই ২০ মণের জায়গায় ১০ মণ করে হচ্ছে। ধান এমন সময় পেকেছে, ওইসময় লাগাতার বৃষ্টি হয়, ধান ঝাড়ানো হবে কী করে? একবছর ওপরে তেরপল দিয়ে খুঁটি দিয়ে মাচা করা হয়েছে। মাঠে জল। ধান কেটে প্লাস্টিকের ওপর রাখতে হচ্ছে। সেই প্লাস্টিক নৌকার মতো করে টেনে আড়ায় তুলতে হচ্ছে।"

বিষ্টুর কথা শুনে আমি ওর চিন্তাভাবনার সামান্য নাগাল পাই। ও বলছে, 'মন চাইলে করতে পারি, নাও করতে পারি'! কিন্তু ওর এই মনটার গড়ন কেমন? এর উত্তর আমি পাই প্রদীপের কাছ থেকে।

চাষির অন্য চিন্তাভাবনা

"চাষের ওপর কোনো বাবু আর নির্ভরশীল নয়। প্রত্যেক লোকের ***অন্য চিন্তাভাবনা*** আছে। ধরো, চাষ বলতে তো পনেরো দিনের ব্যাপার। চাষি লাঙল দিল, রোয়া–টোয়া করে, যার শ্যালো আছে তাকে বলে দিল তুই আমায় জল দে, তোর সঙ্গে কন্ট্রাক্ট আছে, তুই জল দিয়ে চলে যাবি। বাড়িঘরে বউকে বলে গেল, মাঝে মাঝে গিয়ে যদি দেখতে না পারিস, লোক লাগিয়ে কীটনাশক স্প্রে করে তার পয়সা দিয়ে দিস। মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে নিস, জমিতে জল আছে কিনা, ফেটে গেছে কিনা। আমি চললাম আলুর স্টোরে। আমি চলে গেলাম রাইসমিলের কাজে। আমি চলে গেলাম রাজমিস্ত্রির কাজে। দু–এক বিঘা জমিতে ওইটুকু কাজের জন্য আমি তিনমাস পোঁদ ঘসবো কেন? বাইরে গিয়ে আমি ১৫০০০ টাকা নিয়ে আসব। তাও যদি ব্যবস্থা করতে না পারি, দরকার নেই, জমি ভাগে দিয়ে দে। না

চাষ করেও তো পাঁচ মণ ধান পাব। ভাগে যে করছে, সে বেশি পরিমাণ জমিতে চাষ করছে। আমি পাঁচ বিঘা জমি চাষ করে জমিনের কাছে বসে থাকি, তার একটা মানে আছে। পাঁচ বিঘা জমিতে চাষ করে আমি ৪০০০ করে ২০,০০০ টাকা লাভ পাব। যারা এইরকম ভাগচাষ করে, তাদের হয়তো গ্রামে অন্য কাজ আছে। দোকান আছে, টিউশনি করছে কিংবা এলআইসি করছে, কি অন্য কিছু করছে।

আমার জ্যাঠার ছেলেকে আমি দাদা ডাকি। দাদার বড়ো ছেলেটা পিকুর (প্রদীপের ছেলে) চেয়ে এক বছরের ছোটো। সে উচ্চমাধ্যমিক দেওয়ার পরে আমার ছোটোভাই ওকে নিয়ে গেছে। খাওয়াদাওয়া নিয়ে প্রায় সাত হাজার টাকা মতো পায়। গ্রামের ছেলেগুলো যারা যায়, ফাটকাবাজও হয়। বাড়িতে ঠিকমতো টাকা পাঠায় না। আমার ছোটোভাই ওকে ধমক দিল, 'তুই হাড়িতে তৈরি করা ভাত খাচ্ছিস, কোম্পানিতে যাচ্ছিস চা-বিস্কুট পাচ্ছিস।' চক্ষুলজ্জা, মানবিকতা থাকে তো! এইভাবে একে অপরকে বকে দিলে শোনার জায়গা থাকে, শহরের মতো তো নয়। এইভাবে ঘরে হয়তো পাঁচহাজার টাকা ইনকাম হয়। দাদা নিজে ১০০ দিনের কাজের জবকার্ড পেয়েছে। সেটা বউদিকে দিয়ে দিয়েছে। দাদা জমিজায়গা লক্ষ্য রাখে প্লাস একটা ভ্যানরিকশা কিনে নিয়েছে। সারাদিনে ৫০-৬০ টাকা যা হল তাই হল। চায়ের দোকানে বসে আছি, ভাড়া হল তো হল, নাহলে ঘরে চলে এলাম। জ্যাঠামশাই ঠাকুর্দার আমল থেকে সংসার চালাতেন, গোপনেও কিছু টাকাপয়সা করে নিয়েছেন।

চাষ সবাই করছে। যাদের বেশি জমি, লোক নেই, সে এক ফ্যাসাদ! সবটাই যদি লোকের ওপর নির্ভর করে চাষ করে, তাকে ঘর থেকে আরও দিয়ে আসতে হয়। এবার পাঁচ বিঘা জমি, ঘরে তিন ভাই কি চার ভাই আছি, দরকার মতো একটা লোক ধরে নিলাম। আবার গায়ে-গায়ে জমি, তোর জমিতে আমি চারদিন খেটে দিলাম, তুই আমার জমিতে চারদিন খেটে দে। বদলিতে কাজটা হয়ে গেল, ঘরের পয়সা ঘরেই থেকে গেল। পাঁচ বিঘা জমি থেকে লভ্যাংশটা বেরিয়ে এল। শুধু চাষে কেউ নেই। যে কোনো একটা আলাদা কিছু করে। পাম্পসেট করুক বা সে ভ্যান চালাক বা ইলেকট্রিকের দোকান করুক। *সম্পূর্ণ চাষের ওপর নির্ভরশীল কেউ নেই।*"

লাগালাগি বাস আর দেখাদেখি চাষ

ইচ্ছাবাড়িতে বোরো চাষ একসময় ছিল না। অধিক ফলনশীল ধানের চাষও ছিল না। দেশি ধানের বীজেই চাষ হত। তারপর শ্যালো পাম্প, বোরো চাষ আর বিদেশি ধানের বীজ সবই এল। প্রদীপের কথায়, "*লাগালাগি বাস আর দেখাদেখি চাষ।* একটা ফাঁকা জায়গায় একটা ঘরে যদি কেউ বাস করে, তারই ভরসায় অন্যরা গিয়ে বাস করে। চাষটা হচ্ছে, যে যেমন চাষ করে, পাশের চাষি তাকে অনুকরণ করেই চাষ করে। এটা গ্রামের পর গ্রাম আর মাঠের পর মাঠ যায়। কালকের কথা কেউ ভাবছে না। আজকের বেঁচে থাকা নিয়ে কিন্তু সবাই ব্যস্ত। আজকের জীবনযাত্রা যে কঠিন। পরস্পরে আলোচনা কোথায় হয়? সারাদিন পরিশ্রম করে সবাই যখন চায়ের দোকানে যাচ্ছে, আড্ডা মারছে এক জায়গায়। কার কী লাগবে, কার লোক লাগবে, কার জমিতে কে টাকা পাবে, কার জমিতে কী ধান ভালো হয়েছে — হ্যাঁ রে একই ধান আমি লাগিয়েছি, ওর হয়েছে ২৭ মণ, আমার হয়েছে ২৬ মণ। বিঘা প্রতি এই সার দিয়েছি, কীটনাশক দিয়েছি, দুবার লাঙল দিয়েছি, জল দিয়েছি, তাহলে আমার কম হবে কেন? এইভাবে একদিকে চিন্তাটা গড়িয়ে যায়।"

ধান চাষের মাঠে ফিশারি

বিষ্টু বলে, "আমাদের এই এলাকায় তিনবছর চিংড়ি চাষ আরম্ভ হয়েছে। কী কারণে লোকে এই চাষে যাচ্ছে? বর্তমানে জমি তো একই রকম আছে। জমি তো আর বাড়ছে না। কিন্তু জনগণ বাড়ছে। তাহলে প্রত্যেক পরিবারে জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। খাদ্যে ঘাটতি হচ্ছে। ফিশারির ব্যবসাতেও ঝুঁকি আছে। তবুও মানুষ যাচ্ছে। কারণ কী? চেন্নাই থেকে বাগদার মীন আসে। একটা মাছকে মেডিসিন খাওয়ানো, ওই পয়েন্টটা কাটতে সাজ-সরঞ্জাম — মেশিন, আলো, তেল, জল — সবকিছুর খরচা হচ্ছে। গ্লুকন-ডি, কমপ্ল্যান, ঘরে পাতা গরুর দুধের দই, ব্রিটানিয়া বিস্কুট, সব উন্নত মানের খাদ্য ব্যবহার করা হয়। মেশিন দিয়ে খাল থেকে নোনা জল নিয়ে আসা হয়। ওই ফিশারির কাছে ধানের জমি থাকলে কীটনাশক ব্যবহার হলে সেই গ্যাসটাও মাছের পক্ষে ক্ষতিকারক। যদি মাছের ক্ষতি হয়, এর জন্য চাষিকে জরিমানা দিতে হবে। সবাইকেই সাবধানে নিজের চাষ করতে হবে। পেচ্ছাপটা করতে হলেও পারের সাইডে গিয়ে করতে হবে। আমাদের নিজেদের ঘরের কী পরিবেশ! ফিশারির মধ্যে চলে গেলে রাজবাড়ি মনে হবে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে। আপনাকে ফিশারিতে ঢুকতে গেলে ব্লিচিং-জলে পা ডুবিয়ে ঢুকতে হবে। একটা মাছের পিছনে খরচা হয় ৫ থেকে ৬ টাকা। ওই মাছটা মার্কেট-দরে বিক্রি করলে পাব ১২ টাকা। এটা প্রথম বছরের খরচা। দ্বিতীয় বছরের খরচাটা কী? আমার মাটি খোঁড়া হয়ে গেছে, অ্যাসেট থেকে যাচ্ছে। তখন শুধু মেডিসিন আর খাবার দিয়ে একটা মাছের পিছনে খরচা হচ্ছে ৩ টাকা। গতবছর একটা মাছ ১২ টাকায় বিক্রি করেছি। এবছর যদি রেট বাড়ে, ১৫ টাকা হয়ে যাবে। যদিও মেটিরিয়ালের দামও বাড়বে। খরচ হয়তো ৩ টাকার জায়গায় ৪ টাকা হবে। অ্যাসেট থেকে যে পুঁজিটা থেকে যাচ্ছে, সেদিক থেকে লাভ। ঝুঁকি নিয়েও লোকে এই চাষ করতে যাচ্ছে। ঝুঁকিটা কী? যদি ফল্ট লেগে যায়, তার মরা ছাড়া আর পথ নেই। ফল্ট হল ভাইরাস। ভাইরাস লেগে গেলে ওই মাছ গর্ত খুঁড়ে ঢুকিয়ে ব্লিচিং-ফ্লিচিং দিয়ে মাটি চাপা দিতে হবে। না করলে আবহাওয়াটা বিষাক্ত হয়ে যাবে। তাহলে আমার জন্য অন্যের ক্ষতি হবে। তার জন্য আমায় জরিমানা দিতে হবে। আর *একবার যদি এই ব্যবসায় কেউ জিততে পারে, তাকে আর কেউ ধরতে পারবে না।* গত সিজনে পূর্ব এলাকায় ভাইরাস লেগেছে। শতকরা ৭০-৮০% ফিশারির চাষ ভাইরাসে নষ্ট হয়েছে। কালীনগরের ওসাইডে দুর্গানগর, যেখানে আমার মামাবাড়ি, ওখানে একচেটিয়া ফিশারি। মৌজা হিসেবে ওখানে ৯০% ধানের জমি ফিশারিতে চলে গেছে। মামার এলাকা দুর্গাপুরে এমন অবস্থা এখন, পায়খানা করতে হলেও আমাকে ঘরকে আসতে হবে। পায়খানা তো দূর, কোনো থুতু ফেলা যাবে না, বিড়ি ফেলা যাবে না। কেউ কেউ ১০-১৫ ফুট নিচের দিকের লেয়ারে বোরিং করে পাইপ বসিয়ে পায়খানা তৈরি করেছে। গতবছর আমার মামাদের তিনটে পয়েন্ট চলে গেছে। আর পাঁচটা পয়েন্ট ছিল, সেগুলো দিয়ে মোটামুটি মাথায় মাথায় মেকআপ হয়ে গেছে। ওরা আজ চোদ্দো বছর এই চাষ করছে। প্রথম বছর যে ডাউন খেয়ে যাবে, তার সারা জীবন শেষ। দু-লাখ টাকা দেনা নিয়ে আমি এই চাষ করেছি। আমার

যদি ভাইরাস লেগে যায়, আগের (সামনের) বছর আবার দু-লাখ টাকা লাগাতে হবে। তাহলে চার লাখ টাকার অ্যাসেট এসে যাচ্ছে। এর পুরো ইন্টারেস্ট গুনতে হবে। তার পরের বছর যদি ভগবান দেয়, তাহলে মাথায় মাথায় এসে যাবে। ধরো, আমার পয়েন্টটায় ভাইরাস লেগে গেছে। পাখি একটা মাছ তুলে নিয়ে অন্য পয়েন্টে ফেলে দিল। কারেন্টের মতো ছুটবে ভাইরাস। এ মারাত্মক ব্যাপার। আমাদের চার বিঘা পয়েন্টে আমি পেয়েছি ২০,০০০ করে ৮০,০০০ টাকা। প্রথম বছরে আমি পাঁচটা পয়েন্ট করে দিয়েছি। আমার তিনটে পয়েন্ট কেটে গেলেও আর যে দুটো আছে, ওটাই লাভ দেবে। তার পরের বছর পাঁচটা পয়েন্টে আমি পাঁচ দুগুণে দশ লাখ টাকা লাভ করব। ব্যস্! গতবছর আমাদের চার বিঘেতে চারজনের শেয়ার ছিল। এবছর দুজন ছেড়ে দিয়েছে। দু বিঘা করে দুজনের আলাদা আলাদা চাষ হচ্ছে এবার।"

চাষিমনের রূপান্তর

জানা পরিবারের এই বিবরণ থেকে আমরা চাষিমনের রূপান্তরের একটা ধারণা পাই। কৃষিকাজ বা চাষবাস চাষির জীবনের অঙ্গ। মনের সঙ্গে কাজ একই সুরে বাঁধা। তার চিন্তাভাবনা এতটুকু নিরালম্ব নয়। এতকাল সেই মন শহরের বস্তি আর কারখানায় গিয়েও গ্রামসমাজের (কৌম) আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করতে পারেনি। নানান সংকটে সে ফিরে আসতে চেয়েছে, আশ্রয় খুঁজেছে তার পুরনো ভিটেমাটিতে। কিন্তু আজ সেই চাষিমন আরও গভীর এক সংকটে টালমাটাল।

সেই গভীরতর এক সংকটের পদধ্বনি শোনা যায় চাষিদের নিজেদের ইতিহাসের বর্ণনায়। প্রদীপের প্রতিবেশী বিমলকাকা স্মৃতিচারণ করেন, "১৩৭৪ সালে (বঙ্গাব্দ) বন্যা হয়। ফসলহানি হয়ে গেল। মানুষ বাঁচবে কী করে? এবারে একটা বিকল্প ধানের চাষ এল। জল কোথায় পাওয়া যাবে? টিউবওয়েল গেড়ে প্রথমে সেই চাষ আরম্ভ করা হল। বিভিন্ন রকম ধান পশ্চিম থেকে আনা হয়েছিল, উচ্চফলনশীল আইরেট, আই-আর ৩৬, জয়া। টিউবওয়েল টেপা একটু কষ্ট হয়। তারপর পুকুর কাটা হল। পুকুর কেটে পাইপ দিয়ে জল তোলা হল। সেই থেকে জলসেচ করে পুরো মাঠে চাষ হত। তারপরে ১৩৭৬-৭৭ নাগাদ মথুরা থেকে এসে এখানে শ্যালো গাড়া আরম্ভ করল। পুরো মাঠে (২২০০ বিঘার মৌজা) বোরো চাষ হল। তখন খুব কম পয়সাতে চাষ হত, লাভ প্রচুর। বিঘা প্রতি ৪০০-৫০০ টাকা খরচ দিয়ে ভালোই লাভ হত। এইভাবে চলতে চলতে এমন অবস্থা হল, সেইসব শ্যালোতে নোনা ওঠা শুরু হল। একই লেয়ারে (জলস্তরে) ছিল মিষ্টি জল, সেই লেয়ারে এসে গেল নোনা জল। আট-দশ বছরে এই পরিস্থিতি হল। মাঠে চাষ বন্ধ হয়ে গেল। জমিতে রুইলে গাছ হয়ে যাচ্ছে, ধান আর তেমন হচ্ছে না। সকলে ভাবল, ওই লেয়ারে তো আর হবে না। কী করা যায়? শ্যালো আরও ডিপে গাড়তে হবে। আগে ছিল ৬০ ফিটে, এবারে ২৫০-৩০০ ফিট নিচে দিয়ে দিল। আবার সুস্বাদু মিষ্টি জল উঠতে লাগল। সেই থেকে এ পর্যন্ত চাষ চলে এসেছিল। পরে তেলের (ডিজেল) দাম বাড়ার জন্য খরচা বেশি পড়ে গেল। বোরো চাষে লাভ কমে গেল। ফলনও কিছু কমল। ২০১১ সালে চাষ একদম বন্ধের মাথায়। মানুষ আর খরচায় পোষাতে পারছে না। তারপর গ্রামে ইলেকট্রিক এল। কিছু লোক মিনিডিপটিউবওয়েল চালানোর জন্য ব্লকে কারেন্টের অ্যাপ্লিকেশন করল। তারা পারমিশন পেয়েছে।" আবার বোরো চাষে ইচ্ছাবাড়ির মানুষ উৎসাহী হয়ে উঠেছে। যার জমি নেই বা নামমাত্র আছে, সে ভাগে নিয়ে চাষ করেছে। ফলন সামান্য বেড়েছে।

১৩৭৪ বঙ্গাব্দের বন্যায় ইচ্ছাবাড়িতে দারুণ খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছিল। আজ তা নেই। দু-এক বিঘায় ধান চাষ করলে চাষির খোরাকি হয়ে যায়, খাদ্যাভাব মেটে। কিন্তু চার দশক আগের সেই সময়ে চাষির মনে 'অধিক ফলন', 'লাভ'-এর হিসেব ছিল না। ক্যাশ টাকার প্রয়োজন ছিল নিতান্তই কম, বিশেষত সংখ্যাগরিষ্ঠ ছোটো চাষিদের পরিবারে। আজ সেই হিসেব সর্বব্যাপী, সকলের মনে। তাই সে ধানের জমি নষ্ট করেও ফিশারি করতে উন্মুখ। তাকে বড়োলোক হওয়ার কায়দা শিখিয়ে দিয়ে গেছে 'বিদেশিরা'! বিদেশি বলতে যারা পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলবর্তী দীঘা, শংকরপুর, জলদায় চিংড়ি চাষ নিয়ে এসেছিল। এক-একজন ৩০-৪০ বিঘা জমির ওপর ফিশারি করেছিল। কোটি কোটি টাকা লাভ করেছে তারা। পরে ভাইরাসের মড়ক লেগেছে, তারা ছেড়ে পালিয়ে গেছে। কিন্তু টাকা কামানোর উপায় শিখে নিয়েছিল দুর্গাপুর গ্রামের (প্রদীপের মামাবাড়ি) চাষিরা। তাদের থেকে শিখেছে বিষ্টুরা।

বিষ্টুকে আউশের চাষ নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে বলেছিল, 'মন চাইলে করতে পারি, নাও করতে পারি'। সেই মনে এখন অনেকরকম হিসেবের টানাপোড়েন।

মন্থন সাময়িকীর গ্রাহক হোন।

ডাকযোগে সারা বছরের ছ-টি সংখ্যার গ্রাহক চাঁদা পঞ্চাশ টাকা।

যোগাযোগ

জিতেন নন্দী, বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮

দূরভাষ : ২৪৯১৩৬৬৬, ই-মেল : manthansamayiki@gmail.com

কৃষির পট পরিবর্তন

*'চাষির কাছে ধান চাষ কতটা উপযোগী' এই বিষয় নিয়ে যখন মন্থন সাময়িকীতে চর্চা চলছে, তখন 'ফ্রন্টিয়ার' পত্রিকায় 'কৃষির পট পরিবর্তন' (**Changing Agricultural Scenerio, Vol. 44 : No. 45, 20-26 May 2012, Frontier**) শিরোনামে কিছু সম্পাদকীয় মন্তব্য করা হয়। বিষয়টির গুরুত্ব বিচার করে আমরা এই বিষয়ে চিন্তাভাবনা করেন এরকম কয়েকজনকে ওই মন্তব্যের ওপর কিছু বলতে বলি এবং একটা সংলাপ গড়ে তোলার চেষ্টা করি। 'ফ্রন্টিয়ার' পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্য সহ এপর্যন্ত পাওয়া তিনটি মন্তব্য আমরা এখানে প্রকাশ করছি। ইংরেজি থেকে এগুলি অনুবাদ করেছেন তমাল ভৌমিক। আশা করি, এই সংলাপে আরও অনেকে যোগ দেবেন।*

সম্পাদকীয় মন্তব্য, ফ্রন্টিয়ার

ভারতের দরিদ্র জনসাধারণের এক বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কোনোরকমে নিজেদের খাবারটুকু জোটায় আর সরকার খাদ্যশস্যে যে ভরতুকি দেয় তার ওপর এই মানুষগুলো নির্ভর করে থাকে। কিন্তু যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী দিন দিন সংখ্যায় বেড়ে চলেছে, তাদের চাহিদা হল আরও বেশি পরিমাণে উৎকৃষ্ট খাবার। আর ঠিক এখানেই কৃষি–বাণিজ্যের সামাজিক ভিত্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে। ২০১০–১১ সালে রেকর্ড পরিমাণ ২৪১৬ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়েছে। তুলনামূলকভাবে অনুমান করলে ২০২০–২১ সালের মধ্যে ভারতীয়রা বছরে ২৮০০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য ভোগ করবে। ভারতবর্ষের কৃষিজমিগুলো আকারে ছোটো। তাই এখানে কৃষিকাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির পরিমাণ বরাবরই অন্যান্য দেশের তুলনায় কম। যেখানে সারা বিশ্বে মাথাপিছু কৃষিজমির পরিমাণ ৩.৭ হেক্টর, ভারতে ৮৩%–এর বেশি ক্ষেত্রে কৃষিজমির পরিমাণ মাথাপিছু ২ হেক্টরেরও কম। ভারতীয় কৃষিতে চীনের তুলনায় অর্ধেক এবং জাপানের তুলনায় এক–দশমাংশ শক্তি (পাওয়ার) ব্যবহার হয়। অ–কৃষি কর্মক্ষেত্রের প্রসারের জন্য সরকার যেসব নীতি গ্রহণ করেছে, তার ফলে কৃষিশ্রমিকের জোগানে টান পড়েছে। সম্প্রতি এই কারণেই মহারাষ্ট্রে কৃষ্ণা নদীর দুই পারে চাষিরা আখ চাষে নতুন চাষের সরঞ্জাম কিনে কৃষিমজুরের অভাব সামাল দিচ্ছে। গ্রামীণ পরিবারগুলোর জন্য নিম্নতম মজুরি নিশ্চিত করার যে পদক্ষেপ সরকার নিয়েছে, তাতে গত এক বছরে মজুরি অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। শহরায়নের ফলেও মজুরির খরচ বেড়েছে। ২০০১ থেকে ২০১১, এই দশ বছরে শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যেখানে ৩১.৮%, গ্রামাঞ্চলে সেই হার ১২.২%।

গত পাঁচ বছরে ভারতে ট্রাক্টর বিক্রি বেড়েছে ৪২%। হিসেব মতো ২০১১–১২ সালে সংখ্যাটা দাঁড়াবে ৫,৫২,৪৩৪। কৃষি উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি চাষিদের আরও খরচবহুল জীবনযাপন চালিয়ে যেতে সাহায্য করছে। ১৯৬০–এর দশকে প্রতি একর কৃষিজমিতে পশুশক্তি ব্যবহার হত বছরে ১৫০০ ঘণ্টা আর তা এখন কমে দাঁড়িয়েছে ৩০০ থেকে ৪০০ ঘণ্টা। বিশ্বে যে দেশগুলোয় সবচেয়ে বেশি ট্রাক্টর উৎপাদন হয়, তার মধ্যে ভারত অন্যতম। নির্মাণ–ক্ষেত্রে মাল বওয়ার জন্য অথবা বিয়েবাড়ির সাজসজ্জা থেকে শুরু করে কৃষিজ ফসল, খেতমজুরদের বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বরাবরই ট্রাক্টর ব্যবহার হয়ে এসেছে। বর্তমানে ছোটো আকারের ট্রাক্টরের চাহিদা বেড়ে চলায় বেশিরভাগ ট্রাক্টর উৎপাদক ছোটো এবং কম খরচের ট্রাক্টর বেশি করে তৈরি করার দিকে ঝুঁকছে। প্রান্তিক চাষিরা বিশেষভাবে তৈরি ট্রাক্টর ব্যবহারে উৎসাহ দেখাচ্ছে। বহু চাষি, যাদের জমির পরিমাণ ও আয় কম এবং ওই আয়ে যাদের পক্ষে ট্রাক্টর বা অন্যান্য দামি কৃষি যন্ত্রপাতি কেনা সম্ভব নয়, তারা ওগুলো ভাড়া নিচ্ছে, অর্থাৎ তা আর্থিকভাবে সম্ভব হয়ে উঠেছে। মাঝের কিছু লোক কৃষি যন্ত্রপাতি ও পাম্পসেট কিনে চাষিদের কাছে ভাড়া খাটাচ্ছে। কিন্তু কৃষিক্ষেত্রে গবাদি পশুর ব্যবহার কমে যাওয়ায় গোবর ও সারের সংগ্রহও কমে যাচ্ছে। এর ফলে চাষিরা রাসায়নিক সার কিনতে বাধ্য হচ্ছে। যেহেতু প্রতি বছর ২ কোটি টন রাসায়নিক সার বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়, সারের দাম কম রাখতে সরকারকে আমদানির ওপর ভরতুকি দিতে হয়।

ভারতীয় কৃষির চেহারার এই পরিবর্তনকে বামপন্থীরা উপেক্ষা করেছে। ফলত, দেশের সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা যেসব অঞ্চলে ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার ও হারভেস্টারের মতো কৃষি যন্ত্রপাতির প্রবেশ রাজনৈতিক ও নিরাপত্তাজনিত কারণে বর্তমানে ব্যাহত হয়ে রয়েছে, সেখানেও কৃষিকাজে ব্যাপক শিল্পায়নের বিরুদ্ধে কোনো অর্থপূর্ণ প্রতিরোধ গড়ে তোলার অবস্থানে বামপন্থীরা নেই। ১৯৮০–র দশকে চাষিরা, বিশেষত ধনী ও মাঝারি চাষিরা তাদের ফসলের লাভজনক দামের জন্য আন্দোলন করত। কিন্তু যোশি–টিকায়েতের আন্দোলন বেশিদিন টেকেনি। কারণ তারা বিষয়টাকে মাণ্ডি বা ফসলের হোলসেল বাজারের বাইরে নিয়ে যেতে পারেনি। সংকীর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টির জন্য কৃষি–প্রশ্নকে সামগ্রিকতায় হাজির করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। চিরাচরিত বামধারার চর্চা থেকে দেখা যাচ্ছে যে তারাও স্রোতের পক্ষেই এগিয়ে যেতে চাইছে, যদিও তা খানিকটা নিষ্ক্রিয়ভাবে। এখন খুচরো ব্যবসায় এফডিআই (বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ) এক বাস্তব বিষয়। কিন্তু যে বিষয়টা নজর এড়িয়ে যাচ্ছে, তা হল, খুচরো ব্যবসার সঙ্গে বহুজাতিক কর্পোরেশনের সংযোগ ভারতীয় কৃষিকে বিপুল শিল্পায়নের দিকে ঠেলে দিতে চলেছে এবং তার ফলে ছোটো জোত বিলুপ্ত হবে। ফলস্বরূপ মহানগরগুলির প্রান্তে বিপুল সংখ্যক নিঃস্ব চাষি ও বস্তিবাসী জড়ো হবে। কৃষির এই গড়ে ওঠা প্রেক্ষাপটে যা খুবই জরুরি তা হল কৃষক–প্রশ্নটি নিয়ে পুনর্বিবেচনা করা। এটা চিরাচরিত বা অ–চিরাচরিত কোনো ধারার বামপন্থীদের অ্যাজেন্ডায় নির্দিষ্টভাবে নেই।

দেবল দেবের মন্তব্য

সূত্রের উল্লেখ ছাড়া পরিসংখ্যান সম্পর্কে কিছু বলা কঠিন। সম্পাদকীয়র (ফ্রন্টিয়ার) বেশ কিছু বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু কিছু বিষয় আছে যেগুলো বাস্তবসম্মত বলে আমার মনে হয় না।

প্রথমত, ভারতীয় কৃষিতে যত জোগান দেওয়া হয়, তার সঙ্গে বিশ্বের গড় পরিসংখ্যানগুলোর তুলনা করার কোনো মানে নেই বলেই আমার মনে হয়। কেন এরকম ধরে নেওয়া হবে যে জাপান, আমেরিকা বা চীনে বেশি বেশি করে শক্তি ও বস্তুগত জোগান দেওয়া হচ্ছে বলে ভারতের কৃষি উৎপাদনের পক্ষেও সেটাই ভালো?

দ্বিতীয়ত, *কৃষি উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি চাষিদের আরও খরচবহুল জীবনযাপন চালিয়ে যেতে সাহায্য করছে* — এটা কি সত্যি?

তাহলে গত দশ বছরে নথিভুক্ত কৃষক–আত্মহত্যার সংখ্যা ৮০,০০০ ছাড়াল কী করে? কেন চাষির সন্তানেরা দলে দলে শহরের দিকে কাজের আশায় ছুটে যাচ্ছে? গ্রামাঞ্চলে পণ্যায়নের বৃদ্ধি এবং কৃষক পরিবারে আরও খরচবহুল জীবনযাপনের মধ্যেকার সম্পর্ক বিষয়ে লেখক সচেতন নন বলে মনে হয়। আরও আশ্চর্যের বিষয়, লেখক ধরে নিচ্ছেন, চাষিরা এই জীবনধারা চালিয়ে যেতে সক্ষম! গ্রামের মানুষের সংস্কৃতির থেকে বিচ্ছিন্ন বাম মতাদর্শের সঙ্গে এই ধারণার মিল রয়েছে।

তৃতীয়ত, কৃষিতে রাসায়নিক জোগানের (যেমন সার) জন্য সরকারি ভরতুকি বাড়ানোর দাবি করেছেন লেখক। এর থেকে বোঝা যায়, তিনি কৃষির পোষণযোগ্যতা নিয়ে চিন্তিত নন এবং চান যে খাদ্য উৎপাদকেরা সবসময় বাইরের (অন্তর্জাতিক কর্পোরেটদের) আমদানির ওপর নির্ভরশীল হয়েই থাকুক! এর ভিতরের কথাটা হল, এইসব রাসায়নিক ও শক্তির জোগান ছাড়া কৃষিকাজ অসম্ভব — এটা 'টিনা' (দেয়ার ইজ নো অলটারনেটিভ) নামক উপসর্গের লক্ষণ।

শেষোত, কিউবায় কৃষিতে (বাইরের কোনোরকম জোগান ছাড়াই) যে বিশাল সাফল্য পাওয়া গেছে, তা নিয়ে একটা অস্বাভাবিক ও অশুভ নৈঃশব্দ বিরাজ করছে। মনে হচ্ছে, এটা 'চিরাচরিত বা অ–চিরাচরিত কোনো ধারার বামপন্থীদের অ্যাজেন্ডায় নেই।'

আপাতত এই। আশা করি আপনি এবং সম্পাদক (যদি তিনি এই লেখা পড়েন) বুঝবেন যে আমার প্রশ্নগুলো আমি তর্ক চালানোর জন্যই তুলেছি, কোনো ব্যক্তিগত আক্রমণ করার মনোভাব আমার নেই।

স্টিফেন মাইকসেলের মন্তব্য

শুরুতেই বলি, 'গরিব' শব্দটা আমি পছন্দ করি না। কারণ এর কোনো মানে নেই। এটা একটা বিমূর্তায়ন। গরিবি এমন একটা সম্পর্ক, যার সঙ্গে শোষণ ও অসাম্য যুক্ত। যেসব মানুষ নিজের জমিতে নিজের খাদ্য ফলায়, তাদের 'গরিব' বলা হয়, কারণ তাদের টিভি নেই, গান শুনতে হলে তারা নিজেরাই গান বানিয়ে সেই গান গেয়ে শোনে। আর যেসব চাষিরা ঋণ নিয়ে কৃষি–যন্ত্রপাতি কেনে এবং বিদেশ থেকে চাষের জোগান আমদানি করে, তাদের বলা হয় ধনী অথবা নিদেনপক্ষে 'আধুনিক' বা 'প্রগতিশীল'। যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে লক্ষ লক্ষ এই ধরনের চাষি দেউলিয়া হয়ে জমি হারাচ্ছে। সেখানে এই ধরনের চাষিদের কৃষিখামারগুলোকে ব্যাঙ্ক বাজেয়াপ্ত করছে এবং সেগুলো 'চুক্তি' চাষিদের দিয়ে চালানো হচ্ছে। জমি, স্থানীয় সমাজ বা পরিবেশের প্রতি এই চুক্তি–চাষিদের কোনো দীর্ঘস্থায়ী দায়বদ্ধতা বা সম্পর্ক নেই।

এটা সত্য যে সাধারণভাবে বামপন্থীদের কৃষি সম্পর্কে কোনো ভালো বিশ্লেষণ নেই। তাদের বেশিরভাগই অগভীরভাবে মার্ক্সের লেখা পাঠ করেছে এবং কৃষি ও পরিবেশ সম্পর্কে জেনে প্রচুর কৃষিকাজ করে গেছে যারা, সেগুলো মোটেই জানে না। চাষিদের নিয়ে মার্ক্সের শেষ জীবনের কাজ সম্পর্কে তারা নিশ্চিতভাবেই কিছু জানে না। ওই কাজগুলো সোভিয়েত ইউনিয়নে চেপে রাখা হয়েছিল, ঠিক যেভাবে খ্রিস্টানরা বাইবেলের বহু অস্বস্তিকর বই চেপে গিয়েছিল এবং বাতিল করেছিল। এইসব বামপন্থীদের দেখে মনে হয়, বৃহদাকার উৎপাদন ব্যবস্থায় তারা পুঁজিপতিদের মতোই মুগ্ধ। এইচ জি ওয়েল্‌স শেষ জীবনে লিখেছিলেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের পরিচালকেরা কেউ চাষি ছিল না, চাষ সম্পর্কে তারা কিছুই জানত না। সোভিয়েত ইউনিয়নের কৃষিব্যবস্থাকে এরা ধ্বংস করেছিল। আজকের লগ্নিপুঁজি চালিত কৃষিতে সম্ভবত ওই একইরকম ঘটনা ঘটতে চলেছে। আপনি যে লেখাটা আমায় পাঠিয়েছেন, সেখানে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোলা হলেও ভালো কোনো বিশ্লেষণ অনুপস্থিত। লেখাটিতে বেশ কিছু পারস্পরিক সম্পর্ককে ব্যবহার করা হয়েছে এবং কোনো ব্যাখ্যা অথবা চিন্তাভাবনা না করেই কতকগুলো সাধারণ ধারণার ওপর ভিত্তি করে কিছু বিষয়কে সদর্থক ধরে নেওয়া হয়েছে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণী 'উৎকৃষ্ট খাবার'—এর চেয়েও বেশি চায় সেইসব খাদ্য যেগুলোর বিজ্ঞাপন তাদের আকৃষ্ট করেছে। আর যে জমি, পরিবেশ ও স্থানীয় সমাজ (মানুষ, উদ্ভিদ ও পশু), সমুদ্রের কথা ছেড়েই দিলাম, তাদের এই উৎকৃষ্ট খাবারের জন্য দরকার, সেগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার খরচ না মিটিয়েই মধ্যবিত্তরা তা পেতে চায়। কৃষি ও প্রকৃতির ছোঁয়া এড়িয়েই মধ্যবিত্তরা বেড়ে ওঠে। এরা শুধু জানে শপিং মল আর সুপার মার্কেটের ভিতরে কী কী আছে। যদি এরা প্রকৃতির কাছে যায়, পর্যটক হিসেবে যায়, মজা করতে বা দেখতে যায়, অনেকটা যাদুঘর বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গিয়ে যেরকম এরা অন্য সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়। খাদ্য অথবা নিজেদের জীবনযাপন এবং কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট চাহিদাগুলির ফলাফল সম্পর্কে তাদের সত্যিকারের কোনো ধারণা নেই। 'উৎকর্ষ' বলতে এরা বোঝে স্থান বা কাল নিরপেক্ষভাবে যা কিছু যে কোনো সময়ে ইচ্ছেমতো পাওয়া যাবে এবং সেগুলো দেখতে হবে সুন্দর আর থাকবে ঝকঝকে প্যাকেটের মধ্যে। নৃতাত্ত্বিকেরা জানে, প্রতি একক পরিমাণ জমিতে ছোটো জোতের চাষ শিল্প–কৃষির তুলনায় অনেক বেশি উৎপাদনশীল। উৎপাদনশীলতাকে কিন্তু একটা কোনো ফসলের চাষ দিয়ে মাপা যায় না। বিভিন্ন ফসল ও বিভিন্ন জীবজন্তুর পাশাপাশি বেড়ে ওঠার সামগ্রিক সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে এটা বুঝতে হয়; আর তার সঙ্গে জমির উর্বরতা রক্ষার খরচ এবং ওই জমি রক্ষার জন্য যেসব স্থানীয় সমাজকে বাঁচিয়ে রাখতে হয় তার খরচটাকেও বুঝতে হয়। শুধু যে হিসেবটা এর মধ্যে আসে না, সেটা হচ্ছে, কৃষিজশিল্প বিপুল লাভের হিসেব অথবা লগ্নি পুঁজির দ্বারা পুঁজির পুঞ্জিভবন কতটা হচ্ছে তার হিসেব।

কতটা শক্তি দেওয়া হল এবং কতটা শক্তি উদ্বৃত্ত হিসেবে পাওয়া গেল, তা যদি কিলোক্যালরিতে মাপা হয়, তাহলে ছোটো জোতের ক্ষেত্রে তার অনুপাত ১:৭; আর শিল্প–কৃষির ক্ষেত্রে এই অনুপাত ৭:১। তারপর এই উৎপন্ন খাদ্যকে পরিবহণ করে দূরের বাজারে নিয়ে গিয়ে রান্না করা খাবার হিসেবে বিক্রি করলে খরচ বেড়ে অনুপাতটা দাঁড়ায় ২১:১। বিপুল পরিমাণ শক্তি (পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস) আমদানি করেই কেবল এটা সম্ভব হয়। শিল্প–কৃষি কার্যকরভাবে জিবাশ্ম–জ্বালানি বাড়িয়ে তোলে, মাটির তলা থেকে খনিজ ও জল বের করে আনে, খাদ্য উৎপাদন এর পার্শ্বফল। অনদিকে চাষির চাষ বেড়ে উঠলে স্থানীয় সমাজ বেঁচে থাকে।

সাধারণত কৃষির মধ্যে রয়েছে মানুষের সঙ্গে পরিবেশ ও স্থানীয় সমাজের খুব জটিল এবং উচ্চ–সমন্বিত জৈবিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক। হাজার হাজার বছরের পরীক্ষা–নিরীক্ষা এবং তার অভিজ্ঞতা থেকেই কৃষিব্যবস্থার জন্ম। সামান্য অতি–অস্থিরতার কারণে শক্তি, প্রাকৃতিক সম্পদ, জল ও শ্রমের মিলিত প্রবাহ এবং ভারসাম্য যদি বিঘ্নিত হয়, এই ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে পারে। চাষিদের সারল্য ও

রক্ষণশীল মনোভাবের জন্য তাদের তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা করা হয়েছে। কিন্তু তাদের এই রক্ষণশীলতার উৎস হল তাপগতিবিদ্যার নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা। এর অর্থ হল, চাষিরা জানে, কিছু না দিয়ে কিছু পাওয়া যায় না। চাষিদের চাষের সঙ্গে সম্বন্ধিত সম্পর্কগুলিকে যদি আপনি খুঁটিয়ে দেখেন, মাটির সঙ্গে চাষির এবং সামাজিকভাবে তাদের কৌমসমাজগুলির মধ্যেকার সম্পর্ককে দেখলে আপনার আর যাই মনে হোক সরল মনে হবে না। শিল্প–কৃষি বাস্তবে এইসব প্রাকৃতিক শক্তি–পথ এবং প্রাকৃতিক ও সামাজিক সম্পর্কগুলিকে ভেঙেচুরে দিয়েছে; আর সেই জায়গায় বসিয়েছে জীবাশ্ম জ্বালানির শক্তিকে, মূলত তা প্রচুর হিংসার মাধ্যমে করেছে (উদাহরণ হিসেবে উপনিবেশবাদ, দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার যুদ্ধগুলো, আমলাতন্ত্রের অনুপ্রবেশ ইত্যাদির কথা বলা যায়)। চাষিরা জানে, আপনি কিছু না দিয়ে কিছু পেতে পারেন না। প্রচুর সম্পদ প্রয়োগ করে এবং প্রাকৃতিক সম্পর্কগুলিকে অবজ্ঞা করে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকা যায় না এবং পরিণামে বিপর্যয় নেমে আসে। জমি, কৃষি এবং অন্যান্য সম্পদের ভিত্তিসমূহকে অতিরিক্ত লুণ্ঠন করে বহু সভ্যতা নিজেদের ধ্বংস করেছে। আগামী দশকগুলিতে যখন জীবাশ্ম–জ্বালানি আরও ফুরিয়ে আসবে, তখন মানুষ বুঝতে পারবে ঠিক কতখানি দক্ষতা, জ্ঞান ও সম্পর্কসমূহকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি। এখন আমরা যা করছি, তা হল, পৃথিবীর ওপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছি।

মাটিতে যা প্রয়োগ করা হয়, তাকে 'সার' বলা উচিত নয়। ওটা হল 'কৃত্রিম বিবর্ধক' বা 'প্রকৃতির পরিবর্ত'। এটা ঠিক যে সার গাছের বৃদ্ধি ঘটায়, কিন্তু কীসের বিনিময়ে? আসলে তা মাটির উর্বরতাকে ধ্বংস করে আর সেজন্যই একে 'সার' বলা যায় না। প্রাকৃতিক গ্যাস নামক জীবাশ্ম জ্বালানির শক্তি প্রচুর পরিমাণে খরচ করে যে নাইট্রোজেন সার তৈরি করা হয়, তা আসলে মাটির জৈব উপাদানগুলিকে ভেঙে ফেলে জীবাণু–গঠন ক্রিয়াকে তরান্বিত করে জমির উর্বরতাকে নষ্ট করে দেয়। জৈব বস্তুগুলি নিজে থেকেই ধীরে ধীরে দ্রবীভূত হয়ে জৈব অম্লে পরিণত হয় এবং মাটির ভিতরে চুঁইয়ে গিয়ে খনিজ বস্তুকে ভেঙে খনিজ লবণ তৈরি করে উদ্ভিদের জন্য। আপনি যদি নাইট্রোজেন ব্যবহার করে জৈব বস্তুগুলিকে পুড়িয়ে দেন, তাহলে আপনিই মাটিতে খনিজ দ্রব্য মেশাচ্ছেন, কারণ মাটি স্বাভাবিকভাবে সেই কাজ করতে পারছে না।

মাটির ভিতর প্রতি ঘন সেন্টিমিটার আয়তনে যে লক্ষ লক্ষ প্রাণ, জীব–জীবাণু, কীট–কীটাণু রয়েছে, তাদের জন্ম মাটির সঙ্গে এবং এক মিথোজীবী সম্পর্ক তাদের রয়েছে মাটির সঙ্গেই — এরাই মাটির গড়ন তৈরি করে, এরাই উদ্ভিদকে রক্ষা করে। মাটিকে উর্বর ও নরম করে রাখার এই কাজ যারা সারাক্ষণ চালিয়ে যায়, নাইট্রোজেন সহ অন্যান্য রাসায়নিক দ্রবত তাদেরকেই ধ্বংস করে। যত বেশি নাইট্রোজেন ব্যবহার করা হয়, মাটি তত প্রাণহীন হয়। উর্বরতা বৃদ্ধির যে প্রাকৃতিক চক্র ছিল, তাকে ধংস করে দেওয়ার ফলে পরিবর্তে আরও নাইট্রোজেন ঢালতে হয়। ওই প্রাকৃতিক উর্বরতা সৃষ্টিকারী জীবকূল না থাকায় মাটির জৈবক্ষমতা কমে যায়, চারাগাছ দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন মাটিতে আরও রাসায়নিক, আরও আগাছা মারার ওষুধ ইত্যাদি দিতে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৪০–এর দশকে যখন প্রথম কীটনাশক ব্যবহার করা হয়, এখন তার চেয়ে ৩০ থেকে ৪০ গুণ বেশি কীটনাশক কৃষিজমিতে ব্যবহার করতে হয় (আমি অবশ্য 'কীটনাশক'কে জীবনাশক বা প্রাণহন্তারক বলাটাই পছন্দ করি)। প্রকৃতিতে কিছু মাংসাশী কীটপতঙ্গ আছে, যারা নিরামিষাশী কীটপতঙ্গদের খেয়ে নিয়ে চারাগাছকে বাঁচায়। 'কীটনাশক'গুলো ওই মাংসাশী কীটপতঙ্গকে মেরে দিয়ে 'পোকাদের' শক্তিশালী করে তোলে। ইতিমধ্যে মানুষ যে খাদ্যগুলো খেয়ে ফেলে, রাসায়নিক ব্যবহার করে চাষ করার ফলে তার মধ্যে পুষ্টি বিবর্ধক বস্তুগুলোর অভাব দেখা যায়। এর জন্য নানারকম হরমোনের অভাব, রোগপ্রতিরোধকারী ক্ষমতার অভাব ও ক্যানসারে মানুষ ভুগতে শুরু করে। এশিয়ার মধ্যবিত্তদের মধ্যে যে ডায়াবেটিস রোগের বিস্ফোরণ ও মেদবৃদ্ধির মহামারী দেখা যাচ্ছে; তাদের মধ্যে ক্যানসার হাসপাতালের জনপ্রিয়তা যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, এগুলি তারই সাক্ষ্য–প্রমাণ।

পরিবেশবাদী ইউজিন ওডাম দেখিয়েছেন যে, কীটনাশক ব্যবহার না করলে প্রথমে ফসলে পোকামাকড় একটু লাগে। তারপর তাদের মাংসাশী প্রাণীরা খেয়ে ফেল এবং তখন ফসলে পোকা লাগার ঘটনা কমে যায় এবং সাময়িক দেখা যায়। ক্ষতির মধ্যে দুর্বল চারাগুলোই একটু বেশি আক্রান্ত হয়। কীটনাশক ও অন্যান্য রাসায়নিক ব্যবহারে মাংসাশী প্রাণ ও প্রতিযোগী প্রাণ ধ্বংস হওয়ায় চারাগাছ দুর্বল হয়, পোকামাকড়ের আক্রমণ বাড়ে, তাদের কীটনাশক প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়ে এবং তখন আরও বেশি বিষাক্ত কীটনাশক আরও বেশি ব্যবহার করার প্রয়োজন দেখা দেয়।

আপনি যদি প্রকৃতির স্বাভাবিক চক্রগুলোকে বুঝতে পারেন, তাহলে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতেই জমিকে খুব উর্বর রাখতে পারেন। চাষিদের এই জ্ঞানের এক বিরাট ভাণ্ডার ছিল। 'ইকোলজি অ্যাকশন' নামে একটা সংগঠন আছে, তারা গত ৪০ বছর ধরে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে চাষের একটা প্রবল চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এখন তারা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে মাত্র ১০০০ বর্গফুট জমিতে (১০টা ৫X২০ ফুট ফসলের জমি) একজন মানুষের খাবার তৈরি করতে পারে। একই সঙ্গে জমির উর্বরতাই শুধু বাঁচিয়ে রাখতে পারে না, অনুর্বর জমিকে উর্বর করে তুলতেও পারে। মূলত এদের কায়দাটা হচ্ছে, 'মাটি তৈরি করা' এবং তার সংলগ্ন প্রাণীসমাজের পুষ্টি বৃদ্ধি করা। এরই পার্শ্বফল হিসেবে খাদ্য উৎপাদন। বিপরীতে, শিল্প–কৃষি পার্শ্বফল হিসেবে 'পেট্রোলিয়াম তৈরি করে', মাটি খুঁড়ে খনিজ বের করে, স্থানীয় সমাজগুলিকে ধ্বংস করে, ক্যানসারের কারণ সৃষ্টি করে, খাদ্যের পুষ্টি কমায় এবং প্রত্যক্ষ ফল ও অভীষ্ট হিসেবে ধনসম্পদ পুঞ্জিভূত করে।

ছোটো জোত স্থানীয় সমাজকে টিকিয়ে রাখতে চায় আর তাতে জমি ও চাষির স্বাস্থ্য রক্ষা করে। পরিবেশগতভাবে মধ্যবিত্তরা পরগাছা হওয়ায় স্থানীয় সমাজের সঙ্গে খাবার ভাগ করতে চায় না। তারা চায়, তাদের জন্যই সব খাবার তৈরি থাক এবং যখন তাদের যেটা খেতে ইচ্ছে করবে দ্রুত একটা গাড়ি চালিয়ে গিয়ে তখনই কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার থেকে কিনে আনা যায়। খাদ্য বিক্রেতার সঙ্গে কোনোরকম বোঝাপড়া বা ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তোলায় সে আগ্রহী নয়।

ভরত মানসাটার মন্তব্য

'কৃষির পট পরিবর্তন' লেখাটিতে কৃষির ব্যাপক শিল্পায়ন এবং বহুজাতিক কোম্পানিদের ক্রমবর্ধমান নিয়ন্ত্রণের প্রেক্ষিতে চাষির বিষয় নিয়ে পুনর্ভাবনার প্রয়োজনকে সঠিকভাবেই উপসংহার টানা হয়েছে।

তবে এই পুনর্ভাবনার বিস্তৃত গতিমুখে যে অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োজন, আমার মনে হয় লেখকের তার অভাব রয়েছে। ভারতীয় কৃষির ৮০ শতাংশের বেশি যেখানে ছোটো জোত, যে কোনো কৃষিনীতির পুনর্বিন্যাসে তাদের চাহিদাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

এতে অনুশোচনার কিছু নেই যে ভারতীয় কৃষিতে চীনের তুলনায় অর্ধেক এবং জাপানের এক-দশমাংশ শক্তি (পাওয়ার) ব্যবহার হয়। এটা শুধু ভারতীয় কৃষির অধিকতর শক্তি-কার্যকরতার (এনার্জি এফিসিয়েন্সি) সূচক, যা প্রবন্ধের লেখক যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি। জীবাশ্ম জ্বালানির ক্রমবর্ধমান অভাব এবং দুর্মূল্যের সঙ্গে সঙ্গে বাইরের (নবীকরণের অযোগ্য) শক্তির ওপর নির্ভরশীলতা বাড়ানোর বদলে কমানো দরকার! স্টিফেন মাইকসেল সঠিকভাবে উল্লেখ করেছেন, ছোটো জোতের চাষে ১ কিলো-ক্যালরি শক্তি ব্যবহারের বিনিময়ে ফসলে ৭ কিলো-ক্যালরি পাওয়া যায়। সেখানে বৃহদায়তন শিল্পকেন্দ্রিক কৃষিতে উল্টোটাই ঘটে। ৭ কিলো-ক্যালরি প্রয়োগ করে ১ কিলো-ক্যালরি ফেরৎ পাওয়া যায়! ছোটো জোতে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যময় জৈব চাষে শক্তি-কার্যকরতা ১০:১ অনুপাতকেও ছাপিয়ে যেতে পারে। এর ফলে কৃষি বৃহদায়তন শিল্প-কৃষির তুলনায় ৭০ গুণ বেশি শক্তি-কার্যকর হয়ে উঠতে পারে!

ভারতীয় কৃষির ভবিষ্যৎ বিচক্ষণ পথ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে শক্তির প্রশ্ন বাদ দিয়েও পরিবেশ, ন্যায়বিচার ও স্বাস্থ্যগত বিবেচনায় তা অবশ্যই সর্বশ্রেষ্ঠ। ব্যাপক রাসায়নিক নির্ভর শিল্প-কৃষি মাটির উর্বরতাকে নষ্ট করে, ভূগর্ভস্থ জলকে নিঃশেষ করে বিষপূর্ণ খাদ্য উৎপন্ন করে। অথচ ক্ষুদ্রায়তন, বৈচিত্র্যময় জৈব চাষ জমিতে পড়ে থাকা শস্যের অবশিষ্টকে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিকভাবে পুনর্ব্যবহার করে মাটির উর্বরতা ও ভূগর্ভস্থ জলের উৎসকে পুনর্নির্মাণ করে এবং তাতে স্বাস্থ্যকর খাদ্য উৎপন্ন হয়। ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অফ এগ্রিকালচারাল সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ফর ডেভলপমেন্ট (IAASTD) তাদের 'বিশ্ব কৃষি প্রতিবেদন'-এ স্পষ্টভাবে আধুনিক শিল্প-কৃষির ক্ষণ-স্থায়িত্বকে চিহ্নিত করেছে। ৬০টি দেশের চার শতাধিক কৃষি-বিশেষজ্ঞ এবং ১০০০ মাল্টি-ডিসিপ্লিনারি পর্যালোচক চার বছর বিশদভাবে অধ্যয়ন করার পর এটি প্রকাশিত হয়েছে। ভারত এই 'প্রতিবেদন'-এর স্বাক্ষরকারী দেশ। অথচ আমাদের দেশের কাউকেই প্রায় এর উল্লেখ করতে দেখা যায় না!

লেখক উল্লেখ করেছেন, প্রতি বছর ২ কোটি টন রাসায়নিক সার বিদেশ থেকে আমদানি করা হয় এবং তার জন্য মোটা ভরতুকি দিতে হয়। এই সারের দাম যত বাড়বে তত ভরতুকি বাড়বে। অতএব এটা কখনই আর্থিকভাবে চালিয়ে যাওয়া যায় না। লেখক এটাও বলেছেন, ভারতে শহরের জনসংখ্যা গত দশকে ৩১.৮% বেড়ে গেছে। এই ধরনের ক্রমবর্ধমান শহরায়নও চলতে পারে না। কারণ মনে রাখা দরকার, গড়ে একজন শহরবাসী একজন গ্রামবাসীর তুলনায় তিনগুণ বেশি জিনিসপত্র ভোগ করে। ন্যাশনাল কমিশন অন ফার্মার্স-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতের চাষিদের ৪০% চাষ ছেড়ে দিতে চাইছে। সরকারের গলদ নীতিসমূহ এবং অবহেলার কারণে তাদের দুর্দশা আজ এই স্তরে পৌঁছেছে। এখান থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়, পরিবেশগত ও আর্থিক কারণে শরণার্থী সম্ভাব্য ২৫ কোটি মানুষ কাজের সন্ধানে তাদের পেটের খিদে মেটাতে শহরের বস্তিগুলোতে ভিড় করবে।

সামনের দিনে আমাদের গ্রামাঞ্চলে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া দরকার। আমাদের মৌলিক চাহিদাগুলো মেটানোর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য আমাদের সামগ্রিক পরিবেশ সহায়ক কৃষি এবং বিকেন্দ্রিকৃত কুটির শিল্পের পথে যেতে হবে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে 'বাম'পন্থীরা নামটুকু বাদ দিয়ে, ব্যবস্থার সঙ্গে অনেকটাই খাপ খাইয়ে নিয়েছে বলে মনে হয়। সামান্য একটা অংশ বাদ দিয়ে তারা বর্তমানে পথহারা। তাদের গভীর তন্দ্রাচ্ছন্ন নিশ্চল অবস্থা ভেঙে জেগে ওঠা জরুরি প্রয়োজন।

চিঠিপত্র

বিষয় : মন্থন

বিগত কয়েকবছর যাবৎ 'সংবাদমন্থন' ও 'মন্থন সাময়িকী'র আমি নিবিষ্ট পাঠক। এই পত্রিকা দুটিতে যাঁরা নিয়মিত লিখে থাকেন, বিভিন্ন সংবাদ পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেন, লেখার সূত্রে তাঁরা আমার পরিচিত। যদিও এই সেদিনমাত্র, গত তেইশে জুনের আগে সাক্ষাৎ পরিচয় হয়ে ওঠেনি।

মন্থন সাময়িকীর এই বছরের মার্চ-এপ্রিল সংখ্যাটিতে খুব প্রাসঙ্গিক কিছু আলোচনা আমার ভাবনার সঙ্গী হয়েছে। কোনো আন্দোলনে শামিল হওয়া একজন বা দুইজন মানুষের সামাজিক প্রতিষ্ঠার কারণে শুধুমাত্র তাঁদেরই অবমাননার প্রতিবাদ করার পিছনে ভুল দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে। এই আন্দোলনকারীরা যতজন রাষ্ট্রীয় শক্তির হাতে অপমানিত বা নিগৃহীত হয়েছেন, প্রত্যেকের জন্যই আমরা প্রতিবাদ করব। আপনারা এই আলোচনার অবতারণা করে খুব ভালো করেছেন।

কলকাতার বস্তি উচ্ছেদ এবং নগরায়ন নিয়ে শ্রী শমীক সরকার যে লেখাটি তৈরি করেছেন, সেটি চমৎকার হয়েছে। লেখাটির ভিতর একটা ঘটনা পরম্পরার ইতিহাস পাওয়া যাচ্ছে। শমীক যা লিখেছেন সেটা চোখের ওপর দেখেছি বলেই হয়তো তার যথার্থতা অনায়াসে উপলব্ধি করেছি। উচ্ছেদ হওয়া মানুষদের শহরের প্রান্তে ঠেলে দিলেও জনসংখ্যার বিপুলতার কথা ভেবে দেখলে মনে হয় আজকের নগরপ্রান্তের এইসব আবাসন কিছুকালের ভিতর শহরের ভিতরে জায়গা করে নেবে। কিন্তু এইসব আবাসনে যথার্থ পুনর্বাসন হয়? কী ধরনের পরিবেশ গড়ে ওঠে এইসব আবাসনে? শৈশব, যৌবন, বার্ধক্য কি স্বস্তি পায় এইসব গৃহে?

আমাদের জীবনযাত্রার ধরনটা কী হওয়া উচিত, সে বিষয়ে সচেতন করবে পরিবেশ দূষণের ওপর অত্যন্ত প্রয়োজনীয় লেখাগুলি। মোবাইল ফোন আর টাওয়ার বা মোটরগাড়ির অপরিমিত ব্যবহারের বিরুদ্ধে আপনারা চমৎকার সব রিপোর্ট আপনাদের কাগজে বার করেছেন। আবার, চাষের ক্ষেত্রে রাসায়নিক সার বা কীটনাশকের ব্যবহার বর্জন করে জৈব সার ইত্যাদি ব্যবহার করবার যথার্থতার কথাও বলেছেন। আমি নিজে সাইকেল চালাতে ভালোবাসি। সম্পূর্ণ নিরীহ এই যানটিকে শুধুমাত্র বড়ো গাড়ির অসুবিধার কারণ ধরে নিয়ে সাইকেল চালকদের ওপর নানাবিধ বিধিনিষেধ চাপিয়ে দেওয়া অত্যন্ত অসঙ্গত। তাদের জন্য একফালি রাস্তা বার করে দেওয়াটাই সঠিক পদক্ষেপ হতে পারে। ...

২৮ জুন ২০১২

শ্যামল চন্দ
রতন পল্লি, শান্তিনিকেতন

স্বত্বাধিকারী জিতেন নন্দী কর্তৃক সি-৫৬৪, ফতেপুর প্রথম সরণী, গার্ডেনরীচ, কলিকাতা-২৪ হইতে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং আর্ট, কলি-৯ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক জিতেন নন্দী।
ওয়েবসাইট : http://manthansamayiki.googlepages.com ই মেল : jiten_nandi@vsnl.net দূরভাষ : 2491 3666